

পাঠ্য পাঠক্রিয়া পঠন : পাঠ্যব্যাপ্তি কী ও কেন

অনিরুদ্ধ লাহিড়ী

বিশেষ কোনো কোনো পাঠ্য সম্পর্কে এক সময়ে এরকম একটি প্রশংসাসূচক মন্তব্য করার রেওয়াজ চালু ছিল যে তারা সচেতনভাবে নিয়ন্ত্রিত। কিন্তু সচেতন নিয়ন্ত্রণের কথাটা উঠলেই আধুনিক পাঠক জরুরি একটি প্রশ্ন তোলেন : সচেতনভাবে নিয়ন্ত্রিত, হ্যাঁ, কিন্তু কার দ্বারা ? তাঁদের আপত্তিটা অনেকটা এরকম দাঁড়ায় যে বাইরে থেকে লেখকের আগন্তুক চৈতন্যের দ্বারা পাঠ্য সংগঠিত ; পাঠ্য-পদ্ধতিলীর তিনিই বাজিগর, তিনি নিয়ন্তা। সেক্ষেত্রে, তাঁদের মতে, পাঠ্য তার স্বাতন্ত্র্য হারিয়ে, জড়-পদ্ধতলীবৎ, পরবশ হয়ে পড়ে ; অর্থ উৎপাদনের দায় ও অধিকার ন্যস্ত হয়, বা কার্যত থেকে যায়, বাইরে, দেশান্তরে, নিয়ন্তা লেখক-চৈতন্যের অনুপস্থিত মন্ডোয়। পরবশ্যতার এই দায়কে নাবালক যে পাঠ্য মেনে নিয়েছে তার অর্থগৌরব খর্ব হতে বাধ্য ; অনেকাংশে তা নিয়ামক লেখক-চৈতন্যের স্বরপ্রক্ষেপে পর্যবসিত হয় মাত্র। অনুরাগী পাঠক সে পাঠ্যে কান পাতবেন ঠিকই ; তবে সেখানে তিনি শুনবেন— না, পাঠ্যের নয়— দূর থেকে ভেসে আসা লেখক-চৈতন্যের আশ্র-বিজ্ঞাপক কণ্ঠস্বরটুকু কেবল। পাঠ্যের আধুনিক

প্রবক্তারা যা খুঁজছেন—বহুস্বর, তাই অনেকাস্ত, এবং অর্গলমুগ্ধ পাঠ্য—ঔপনিবেশিক লেখক-কর্তৃত্বকে সর্বাঙ্গীণভাবে মেনে নিলে তার সমূহ বিলুপ্তি ঘটা সম্ভব, অন্তত তার সংকোচন তো অবশ্যস্বাবী।

এই গোত্রের পাঠ্যকে যদি বন্ধ পাঠ্য বলে অভিহিত করা যায়, এবং যদি ধরে নেওয়া যায় এই জাতের পাঠ্য আদৌ আছে, দেখতে হবে তাদের অর্থব্যাপ্তি এবং নানামাত্রিকতা ক্ষুণ্ণ হচ্ছে কি না; এবং হলে, তা কতদূর পর্যন্ত ও কিভাবে। প্রশ্নগুলিকে অবশ্যই মনোযোগ দিয়ে বিবেচনা করা দরকার। তবে তাদের সদৃশের পেতে হলে আমাদের আলোচনাকে কিছুটা তাত্ত্বিক মাত্রা দিতে আমরা বাধ্য হব। আরো যা বড় কথা, সেক্ষেত্রে তা কোনো অর্থেই টুকরো টুকরো বা ছাড়া ছাড়া ভাবে পাঠ্য নির্মিতির দৃ-একটি উপাদান কিভাবে নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে, আলোচনার সেই এলাকাটুকুর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে না। নির্মিতির ভিন্ন ভিন্ন আদর্শ এবং যুক্তি মেনে পাঠ্যকে গড়ে তুলছে সংগঠক নানা উপাদান। এসবের সমবায়ে বা, আরো জটিলতর অর্থে, টানা-পোড়েনে গড়ে ওঠে যাকে বলা চলে পাঠ্য নির্মিতির ন্যায়। যা প্রয়োজন তা হল এই ন্যায়টিকে ঠিক মতো চিনে নেওয়া, তা ব্যতীত গতান্তর থাকে না।

প্রথমেই স্বীকার করে নেওয়া ভাল যে আদি-মধ্য-অন্তের ক্রমিকতা হল বদ্ধ আখ্যান রীতির একটি প্রধান লক্ষণ, এমন কি তখনও যখন অ্যারিস্টটলিয়ান মূখোস বা নির্মাণ-ক্রমের যুক্তি মেনে তার অগ্রপটে টেনে আনা হয়েছে ঘটনা ক্রমের^১ অন্তর্বর্তী একটি নির্বাচিত ঘটনা বিন্দুকে : ক নয়, হয়তো গ বা ঘ-কে। গঠন ও বদনের শৈথিল্যকে—অন্তত পরিপ্রমী লেখক-চৈতন্যে যা শৈথিল্য বলে প্রতিভাত হয়েছে, তাকে—দেখা যাবে এ জাতের পাঠ্য বরদাস্ত করতে খুব কিছু উৎসুক নয়।

বদ্ধ আখ্যান সচেতনভাবে সংগঠিত, যদিও আখ্যান এক নয় এবং তাদের সংগঠনের আদর্শ ও যুক্তি ভিন্ন ভিন্ন। এক হিসাবে অবশ্য এটা ঠিক যে, সচেতন সংগঠনের মাত্রার হেরফের ঘটটুকু বা ঘটক না কেন, সব পাঠ্যই সংরচিত। সচেতনভাবে সংরচিত যেহেতু, পাঠ্যে ঐ চৈতন্য কার অনুদান? বাইরে থেকে লেখকেরই তো। তাছাড়া সংগঠিতই বা কে করল তাকে? লেখকই তো, বা তাঁর পরিপ্রমী ধ্যান। লেখক-ঈশ্বর যদি মৃতও হন—ইদানীং যে গুজবটা কানে আসছে—ঐ মৃত্যুটা তো রূপক মৃত্যু। লিখছেন যে তিনি সে বিষয়ে বিতর্কের অবকাশই নেই কোনো। এই অর্থে পাঠ্য মাত্রই লেখকজন্য।^২ সব পাঠ্য সম্পর্কে কথাটা কমবেশি সত্য হলেও, লেখকের ধ্যান যখন সচেতনভাবে আড়াল গ'ড়ে, নিজ কর্তৃত্বের ঘেরাটোপের মধ্যে সম্পূর্ণরূপে দাবিয়ে রাখে পাঠ্যকে, প্রয়োজনে তার আভ্যন্তরীণ প্রবণতাকে নাকচ করে হলেও, তখনই মাথা চাড়া দেয় লেখক কর্তৃত্ব-বাদ, পাঠ্য হয়ে ওঠে বদ্ধ এবং পরবশ। এটা যে ঘটতে বাধ্য, সব পাঠ্যের ক্ষেত্রেই এরকম যদি কোনো তাত্ত্বিক সিদ্ধান্তে আসতে বাধ্য হই আমরা, লেখক কর্তৃত্ববাদের প্রযোজ্যতা না মেনে উপায় থাকবে না কোনো। মূর্শকিল

এখানেই। কারণ কিয়দংশে বন্ধ পাঠ্য এবং বিশেষ করে লেখক কর্তৃত্ববাদের বিরুদ্ধে দেখা যাবে আধুনিক রুচি প্রবলভাবে সোচ্চার। কেন, তা ভেবে দেখা যাক।

তত্ত্বগতভাবে এরকম একটি দাবি জানানো হয়— বন্ধ আখ্যান রীতি তার যুক্তিও আদায় করে এরকম একটি বিশ্বাস থেকে— যে পাঠ্যে লেখক কর্তৃত্বই সার্বভৌম। যা নির্মিত হল, এবং নির্মিতের কথামুখে যা বিবক্ষিত হল, তা কেবল হরবোলা লেখকেরই স্বরপ্রক্ষেপ; অধীশ্বর লেখকেরই দাপট চুড়ান্ত, তাই পাঠ্যের তাৎপর্য থেকে যেতে বাধ্য একমাত্র তাঁরই অধীনে। তাৎপর্য কী, তার ঘোষক স্বয়ং তিনি; এবং পরবশ পাঠ্য, নিজে বোবা, তাঁর ঘোষণা মাত্র। লেখক এবং পাঠকের মধ্যে, উপর থেকে নীচে, তাঁর অকুপণ বিবক্ষার ঢাল বেয়ে গড়িয়ে পড়ছে বাণীর ঐশ্বর্য। বাণীর প্রেরক তিনি, তাৎপর্যেরও। পাঠক কেবল কৃতজ্ঞ প্রাপক মাত্র। গ্রহণ করবার সামর্থ্য কি তাঁর আছে? তিনি কি উৎকর্ণ, শূন্যছেন? তা যদি হয়, তবেই তিনি সার্থক।

লেখক কর্তৃত্বের আবেষ্টনীর মধ্যে, একা তাঁর নিয়ন্ত্রণে, গড়ে ওঠে বন্ধ পাঠ্যের তাৎপর্য— নিজের সম্পর্কে এটাই তার দাবি। বিশেষ করে যেসব পাঠ্য সম্পর্কে এ জাতের দাবি রাখা হয় তারা খাপী। তাদের ঘন বুননে এমন কোনো ফাঁক-ফোকর চোখে পড়ে না যার চোরাপথে পাঠ্য ঢুকে পাঠকের অভিপ্রায় নিজের জন্য জায়গা করে নিতে পারে, অনেকটা যেন লেখকের অসতর্কতার সন্যোগ নিয়ে নিজের মতো করে গড়ে পিটে নিতে পারে পাঠ্যকে। এতটাই যদি খাপী হয় পাঠ্য, তাৎপর্য সেক্ষেত্রে অধীশ্বর লেখকের বশে থেকে যেতে বাধ্য। তাকে গড়ে তোলবার ব্যাপারে বেচারী পাঠকের কোনো ভূমিকা থাকে না— তাঁর দ্বারা তা গৃহীত হয় মাত্র। লেখকের দাবি নিঃশর্ত, তাঁর নিবৃদ্ধ স্বত্ব মেনেই কেবল তাৎপর্য গ্রহণের কাজটিতে পাঠককে ব্যাপৃত হতে হয়। তাঁর এই উদ্যোগ বহরে খাটো, এবং ওজনে লঘু; এবং তা এই সরল অর্থেই যে এই পাঠ্য-সংসারের সং-টুকু ছেড়ে সারটুকু বেছে নেবার মধ্যেই নিঃশেষিত হয় তাঁর উদ্যোগ।^৩

এরকম একটি তাত্ত্বিক অবস্থানের বিরুদ্ধে আপত্তি কমবেশি চারের দশকেই উঠেছিল। পাঠ্য যদি নিশ্চিত বা নীরন্ত হয়— যুক্তিটা ছিল অনেকটা এরকম— পাঠকের অভিপ্রায়ের কোনো তোয়াক্কা না রেখে তার ঘেরাটোপের মধ্যে মাথা উঁচু করে দাঁড়ায় স্বয়ম্ভু তাৎপর্য। তবে শূন্য পাঠকের নয়, লেখকের অভিপ্রায়েরও তো তেমন কোনো প্রাসঙ্গিকতা থাকে না। প্রবেশাধিকারও কি থাকে? কী তাঁর অভিপ্রায় ছিল, তিনি শিব গড়তে চেয়েছিলেন কি না, আমরা যারা হাতে পেলাম শিবের পরিবর্তে বাদরকে, এ অলস জল্পনা তো তাদের কাছে পণ্ডশ্রম মাত্র। কাহিনীকার নয়, তোমার আস্থার পাঠ হোক কাহিনীটি—লরেন্সের এই সাবধান-বাণীর তাৎপর্য তো মনে হয় এটাই।

পাঠ্য একটি শব্দবাহু। তার অভ্যন্তরে সশব্দ কোলাহলের জটলা ভেদ করে, আমাদের মনোযোগের কাছে স্বীকৃতির দাবি রাখছে প্রতিবন্দী অনেক স্বর। তাদের কাকে অগ্রাধিকার দেব, কেন, তা কে বলে দেবে? কাহিনী নিজে, না কাহিনীকার?

অর্থের এই মঞ্জুরাটি খুলবার চাবিকাঠিটি কি শেষ বিচারে লেখকেরই হাতে রয়ে গিয়েছে? তকের খাতিরে যদি মেনেও নি যে, হ্যাঁ, এই অনেকান্ত কোলাহলের মধ্যে তাঁর অভিপ্রায়টি মুখ্য, তাঁর দাবি অবশ্যমান্য, তাঁর অনুপস্থিতিতে বা যেখানে কোনো টীকা জোড়েননি তিনি পাঠ্যে, বিশেষ কোন তাৎপর্যটি তাঁর অভিপ্রেত, তা বদখে নেব কোন কষ্টপাথরে ঘষে? বা টীকাভাষ্য সেক্ষেত্রে রয়েছে, তাকে অগ্রাধিকার দিতে কি আমরা তত্ত্বগতভাবে বাধ্য?

পাঠ্যের বহুস্বর প্রতিযোগী জটিলার মধ্যে সঠিক তাৎপর্যের নির্ণায়ক কে—সুদূর, অনুপস্থিত লেখক-ঈশ্বরের আত্ম-বিজ্ঞাপক ঘোষণা, যা শেষ বিচারে পাঠ্য-বহির্ভূত? না কি তার শব্দব্যবহারে ভিতরে কার্যকর আত্ম-নির্বাচনের আদর্শ ও তাগিদ? তাৎপর্য যে আত্মনিয়ন্ত্রিত, অনুপস্থিত লেখক-ঈশ্বরের ভ্রুকুটি-শাসন বা ফতোয়ার পরোয়া না করে পাঠ্যশরীর থেকে স্বতই যে তা উৎসারিত হচ্ছে, এরকম একটি সিদ্ধান্ত মেনে নিলে, এটাও আমরা কার্যত মেনে নিতে বাধ্য হই যে নির্জিত বা পরবশ নয়, পাঠ্য স্বাশ্রয়ী—হয়তো অনেকাংশে তা স্বরাটও। পাঠ্য ও তার তাৎপর্যের মধ্যে, উত্তর-সংগঠনবাদীদের আপত্তি সত্ত্বেও, একটি অভেদ যদি কল্পনা করে নেওয়া যায়, তাহলে বলা চলে যে পাঠ্য নিজেই নিজের সংগঠক ও উন্মোচক। সে কোনো প্রতিনিধি নির্বাচন করে না বা কোনো বকলমা সে দেয় না। সে কী বলছে তা জানতে ও বদ্বতে হলে, যেতে হবে তারই কাছে।

কিন্তু এই স্বাভাবিক্য কি তাকে নিশ্চিত, তাই ইতিহাসের প্রতি বি-মুখ, করে তুলছে না? সব পাঠ্যই কি এই অর্থের রুদ্ধ-স্বার, তাই বন্ধতার দায় মেনে নিশ্চল? না কি পাঠ্য ছিদ্রল, এবং কোনো কোনো পাঠ্য তো তা বিশেষ করে? দাবি করা চলে না কি যে, কমবেশি হলেও, ছিদ্রাশ্রয়ী পাঠকের জন্য নানা রঙ্গ, নানা ফাঁক-ফোকর থেকেই গিয়েছে পাঠ্য শরীরে? অন্তত পাঠ্যের তো রকমফের নিশ্চয় আছে? বস্তুত নিশ্চিততার যুক্তি মেনে নিলে, পাঠ্যের সীমান্তে, ইতিহাসের সঙ্গে তার ভেদরেখা বরাবর নয়, বা যেখানে যেখানে তা ইতিহাসের দ্বারা অনুপ্রবিষ্ট সে এলাকাগুলিতে নয়, বরং তা থেকে দূরে, বিজনে, তার আভ্যন্তরীণ ন্যায়ের কেবল ধরে নিতে হবে উদ্ভূত এবং নিঃসৃত হচ্ছে তার আত্মিক নির্ঘাস। এই বিচারে পাঠকের ভূমিকা নিতান্তই গোণ: সহৃদয় সামাজিক তিনি, তাই যা নিঃসৃত হল, তার রসাস্বাদনে উন্মুখ একজন অলস ভোক্তা তিনি; বা হয়তো অলস তিনি নন, যা নিঃসৃত হল কেবল তার পরিগ্রহী নিক্ষেপনেই তাঁর উদ্যোগ নিঃশেষিত। লেখকের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে তাৎপর্যকে গড়েন না তিনি। পাঠ্যকে বোপে তাৎপর্য তো পড়েই রয়েছে। এই যুক্তিতে, তাকে বেছে ছেঁকে নিতে পারলেই সফল হয় তাঁর দ্বারা সম্পাদ্য আবিষ্কৃত্যের কাজটি।

সমান গুরুত্বপূর্ণ আরেকটি সমস্যা কিন্তু দেখা দেয় সেক্ষেত্রে। তা দেখা দেয় কালিক নিশ্চলতার প্রশ্নটিকে ঘিরে। পাঠ্য যদি নিশ্চিত হয়, বন্ধতার আড়ালে, সংগঠনের আভ্যন্তরীণ ন্যায় মেনেই কেবল তা গড়ে তুলতে পারে তাৎপর্যকে। সেক্ষেত্রে, বোঝা

কঠিন নয়, পাঠ্য এবং তার তাৎপর্য উজ্জানে, নিজ অতীতে, প্রোথিত, তাই বাধ্য হয় কার্যত নিজ অতীতের সঙ্গে সমকালীন থেকে যেতে। যদি ধরে নেওয়া যায় যে পাঠ্য এই অর্থে নিশ্চল, পাঠক্রিয়া কিন্তু আদ্যে তা নয়; কাল থেকে কালান্তরে এবং দেশ থেকে দেশান্তরে তা তো চলতেই থাকছে। স্থান পঠ্যকে পিছনে ফেলে তার ভিন্ন ভিন্ন পাঠক্রিয়া, বলা যেতে পারে, এগিয়ে চলেছে ভবিষ্যতের দিকে। এটা তাই নিশ্চিত যে নিজের ইতিহাস থেকেই যদি নিজেকে পুরোপুরি গড়ে তোলবার রশদ ও যুক্তি সংগ্রহ করতে একান্ত বাধ্য হয় পাঠ্য, সেই ইতিহাসেরই নিভূতে অন্তরীন থেকে যাবে সে; ক্রমবর্ধমান কালিক দূরত্বের কারণে অবশেষে একদিন পাঠক্রিয়ার সঙ্গে সর্বাঙ্গীণ বি-যুক্তিই হবে তার অভ্রান্ত এবং একমাত্র পরিণতি। আর তা যদি ঘটে, ভিকোর যুক্তি নাকচ করে, ঘনীভূত মানব-চৈতন্য পাঠ্যের মধ্যে যে স্বাক্ষর রেখে গেল, ঐতিহাসিক অনচ্ছতার আড়ালে একদিন দেখা যাবে তার পরিচয় হারিয়ে বসে আছে সে। এবং সব পাঠ্যের ক্ষেত্রেই এটা যখন সর্বাংশে সত্য, সাংস্কৃতিক স্মৃতিভ্রংশই হবে অতীতের সঙ্গে সার্বিকভাবে বি-যুক্ত মানুষের চরম আত্মিক পরিণতি।

কিন্তু তাৎপর্যের এই অবলুপ্তি কি ঘটতে বাধ্য? পাঠ্য তো শোনাই যাচ্ছে স-বাক। এ বিষয়ে সন্দেহ মাত্র নেই যে বহু যুগের ওপার হতেও কথা সে বলে, অবশ্য যদি মনোযোগী পাঠক কান পাতেন তার বাস্তবতার এলাকাটির মধ্যে। তবে কি ধরে নিতে হবে যে কান পাতবার সময়ে, অন্তত ঐ মনুহুতটিতে, নিজ কালে গর-হাজির পাঠক উজিয়ে পৌঁছেছেন পাঠ্যের সমকালে? কালিদাস পড়বার সময়ে তাঁর কালে, শেক্সপীয়র পড়বার সময়ে তাঁর যুগে। কালিক এবং স্থানিক ব্যবধান ঘাই হোক না কেন, পাঠ্যের শ্রাব্যতার গাণ্ডটুকুর মধ্যেই কিন্তু থেকে যাচ্ছেন তিনি; উৎকর্ণ হলে, যদি তিনি তা চান, পাঠ্যের চন্দ্রবিক্ষেপের আকর্ষণে গা ঢেলে দিয়ে অথবা সচেতন উদ্যোগে সাঁতার কেটে, ফিরে যেতে হয় তাঁকে বাণীর ঐ উৎসে। ব্যাপারটা সুতরাং দাঁড়াল এই যে পাঠ্য স্থান, এবং তার মধ্যে যেসব অভিপ্রায় যেসব যুক্তি মেনে বিবাক্ষিত হল তারাও তা-ই। উৎসে পৌঁছে, জগম কালের দ্বারা অনাহত, পাঠ্যের ঘনীভূত সারাৎসারকে পাঠকের কর্তব্য হবে এবার তাহলে কায়মনোবাক্যে উদ্ধার করা; এবং তা করে—ভিন্-কালে ঘর বাঁধা তো আর সম্ভব নয় তাঁর পক্ষে—তিনি নিশ্চয় ফিরে আসবেন নিজের সমকালে। এবং যে কোনো মনোযোগী পাঠকের ক্ষেত্রে এই গমনাগমনটি চলতে থাকবে বারেকারেই।

পাঠক্রিয়া চলাকালীন এতক্ষণ তাহলে কিন্তু বেচারী পাঠকটি গর-হাজির ছিলেন নিজের কালে, ফলত নিজের জীবনে। ঐ একই যুক্তি মেনে বলা চলে, যত বেশিক্ষণ যত বেশি সংখ্যক পাঠ্য মনোযোগ দিতে হয় তাঁকে তাদের সারাৎসার সম্বন্ধে ছেঁকে নেবার উদ্দেশ্যে, তত বেশি ব্যাপ্ত হয় তাঁর গর-হাজিরা। আর এই গর-হাজিরার ক্ষেত্রটি বিশেষ করে কী? না, তাঁর নিজেরই কাল, নিজেরই জীবন! বলা চলে, দাক্ষিণ্যের ক্ষেত্রটি যেহেতু প্রসারিত ছিল বাইরে, ঘরের জোগানে টান পড়েছে তাঁর; মনোযোগের

ঢাল গড়িয়ে গেছে দূরে, নিকটের জগৎ তাই আবৃত হয়েছে বিনোদ্যোগে। প্রশ্ন এই : শিক্ষিত পাঠককে বিশিষ্টত হতে বলা, যা শিখেছেন তা ভুলে যেতে বলা, খুব অসমীচীন, খুব গর্হিত হবে কি এর পরেও ? এঁদেরই কেউ কেউ তত্ত্বরচনার আগ্রহে ধ্যানে তৈরি করেন সুদৃশ্য অট্টালিকা ; নিজেরা অবশ্য রাত কাটান কায়ক্রেশে, ভাঙা চালের নীচে।

ব্যাপারটা কিন্তু এতটা করুণ না হতেও পারে। কোনো পাঠাই নিশ্চিন্ত বা নিশ্চল নয় ; তাছাড়া এমনও নয় যে পাঠক্রিয়ায় রত হবার প্রাথমিক শর্তই হল এটা যে সমকাল থেকে সম্পূর্ণরূপে বি-রত, গরহাজির পাঠককে ছুটি নিয়ে পেঁছতে হবেই হবে কালান্তরে, পাঠ্য ও তার তাৎপর্ষ্যের ঐতিহাসিক উত্থানভূমিতে। বরং জঙ্গম অনুক্রমের মধ্যে স্থাপিত ক'রে, কালিক ধারাবাহিকতার আদর্শে চিহ্নিত করতে হবে পাঠ্যকে ; বুদ্ধিতে হবে, তার মধ্যে অতীত থেকে প্রবহমান অভ্যাসসমূহ^৪ প্রবেশ করছে ঠিকই, ব্যক্তও হচ্ছে নিশ্চিত ; কিন্তু প্রক্রিয়াটি সেখানেই থেমে যাচ্ছে না। প্রতিটি নিবিষ্ট পাঠক্রিয়ার বাবদে ভবিষ্যতের সঙ্গেও যুক্ত হচ্ছে সে, এবং তা সে বারোবারে হতেই থাকছে। তাই বিবক্ষিত কী ছিল, কী নয়, তাকে চিনে নেবার তাগিদেই, বিশেষ করে মতাদর্শগত পালাবদলের বাকি বাকি, আবিষ্কৃত— বলা চলে, উৎপন্ন— হতে থাকে তাৎপর্ষ্য ; না, তার কোনো সুনির্দিষ্ট, একরোখা, জেদী একক নয় ; বরং তাৎপর্ষ্য থেকে তাৎপর্ষ্যান্তরের যেন এক নিরবচ্ছিন্ন পর্যায় : তাৎপর্ষ্য সত্যি। পাঠক্রিয়ার পরম্পরা এইভাবে অতীতকে বাজিয়ে বুঝে নেবার সূত্রে, বলা চলে, যেন অতীতকেই উৎপন্ন করছে ; পাঠক্রিয়ার ওরসে একই পাঠ্য থেকে তাই জাত হচ্ছে তাৎপর্ষ্যের পর্যায়। যাকে মনে করা হত স্থাণু, একটি অখণ্ড, গোটা একক, তা হয়ে উঠছে পিচ্ছিল, জঙ্গম ও অনেকান্ত ; পাঠ্যকে আমরা খুঁজছি ঠিকই, কিন্তু যা নজরে পড়ছে, যাকে খুঁজে পাচ্ছি, তা হল তার অবিরত নানামাত্রিক বিচ্ছুরণ।

যেভাবে বস্তব্যটিকে পেশ করা হল তাতে করে একটি আপত্তি উঠতে পারে। সেটি হল এই যে এর মধ্যে একটি বিপজ্জনক ঝোঁক কাজ করছে : তাত্ত্বিক স্বেচ্ছাচারিতা। বেরোয়া, লাগামছুট পাঠক্রিয়া যে হতে পারে না বা তা যে নেই এমন তো নয়, বা এমনও নয় যে আমাদের কারো অভিজ্ঞতায় এতদিনেও এই সহজ সত্যটি ধরা পড়েনি। অমনোযোগ-প্রসূত ও অলস, তাই অববেচক, এবং চালাক ও পল্লবগ্রাহী, তাই মৌক, পঠনের হাজারটা নিদর্শন তো ছাড়িয়ে রয়েছে সর্বত্র, বিশেষত স্বর্গাদিপি যা গরীয়সী আমাদের সেই মাতৃভাষায়। প্রস্তাবিত ব্যাখ্যানে— আপত্তিটি অনেকটা এরকম দাঁড়াচ্ছে— পঠন মাত্রই নাকি হয়ে উঠছে তাৎপর্ষ্যের উৎপাদক, অন্তত বিশেষ বিশেষ পঠন তো নিশ্চয় ; এবং উৎপন্ন পঠনমাত্রই না কি বৈধতার দাবি রাখছে ! তা যদি হয়, তবে এই অমনস্ক, উদ্ভট তাৎপর্ষ্য-তরঙ্গ রুদ্ধিবে কে ? কোন্ অধিকারে ? সঠিক তাৎপর্ষ্যের উৎপাদক একটি কোনো বিশেষ পঠন বেছে নেওয়া কঠিন হতে পারে ; বস্তুত তেমন একটি বিশেষ পঠন যে আছেই এমনও হয়তো নয়। কিন্তু সম্পূর্ণ বৈঠক,

বিভ্রান্ত তাৎপর্ষ্যের উৎপাদক পাঠক্রিয়া যে আছেই আছে, অন্তত তত্ত্বগতভাবে তা যে খুবই সম্ভব, এ বিষয়ে সন্দেহের বিহীনমাত্র কোনো অবকাশ নেই। তাকে বা তাদের সেক্ষেত্রে চিহ্নিত করে খারিজ করা হবে কোন যুক্তিতে ?

এরকম একটি অবস্থানকে যে তাত্ত্বিক স্বেচ্ছাচারিতার দায়ে অভিযুক্ত করা চলে তার একটি কারণ এটাই যে, নিখাদ বা জাল, সব পাঠক্রিয়াকেই তা অগ্রিম বৈধতা দিচ্ছে ; বাতিল করবার ব্যাপারে ততটা নয়, যে কোনো পঠনের বৈধতা নাকচ না করবার ব্যাপারে তার তাত্ত্বিক অসহিষ্ণুতা দেখা যাচ্ছে যতটা উগ্রভাবে সক্রিয়। অভিযোগটিকে আরো বিশদ করে এভাবেও বলা চলে যে প্রতিটি নয়া কিসিমের পাঠক্রিয়াই যখন নয়া কিসিমের তাৎপর্ষ্যের জনক, প্রতিটি পঠনই যেহেতু বৈধ, পাঠক্রিয়ার পরস্পরা চলতেই থাকবে। পাঠ্য নামের এই রত্নগর্ভা বহু-ভর্তুকা সেক্ষেত্রে বাধ্য হবে কেবলই, নিরন্তরই প্রসব করে যেতে— তাৎপর্ষ্যের পর তাৎপর্ষ্যের এক অনন্ত পরস্পরাকে। আরো এগিয়ে গিয়ে হয়তো বলা চলে, কঠোর পিতৃতান্ত্রিক ভগবান যেমন ভগবতীর তোয়াক্কা না রেখে শুদ্ধ ইচ্ছা দ্বারা ইচ্ছা দিতে সক্ষম— বাইবেলের জেনেসিস অধ্যায়টি বা মিশেলোঞ্জেলোর আদমের জন্ম স্মরণ করুন— পাঠক্রিয়াও তেমনি অনেকটা যেন পাঠ্য-নিরপেক্ষভাবে, অর্থাৎ তার সঙ্গে আদৌ মিলিত না হয়ে, নিজ নিজ চিদাকাশেই তাৎপর্ষ্যকে গড়ে তোলবার ক্ষমতা রাখে : প্রসূতি ছাড়াই এ যেন অলীক প্রসব এক ! পাঠ্যের সঙ্গে অভিনিবিষ্টভাবে যুক্ত না হয়েই তা যখন ফল উৎপাদন করছে, সার্বভৌম পাঠক্রিয়া তখন ক্রিয়া হয়েও যে আর পাঠ্য-সাপেক্ষ থাকছে না, এরকম একটি ভয় মনে হয় না খুব কিছু অমূলক।

এর ফলে কি, উল্টো দিকে, তাৎপর্ষ্য নিজেই পাঠক্রিয়া-সাপেক্ষ হয়ে পড়ছে না ? তা যদি হয়, তাৎপর্ষ্যকেও কি সেই একই সঙ্গে পাঠ্যের বাইরেই ঠেলে দেওয়া হচ্ছে না ? পাঠ্যের বাইরেই— তবে লেখকের নয়, পাঠকের দিকটি ঘেঁষে— যেহেতু এই বিচারে তাৎপর্ষ্যের উত্থানভূমি ও চলাচল, লেখকের অভিপ্রায় বা পাঠ্যের আভ্যন্তরীণ ন্যায় নয়, তাৎপর্ষ্য তার বৈধতা অর্জন করছে পাঠক্রিয়ার আত্মরীতি থেকেই মূলত। এভাবেই ধাপে ধাপে, লেখককর্তৃত্ববাদ থেকে স'রে, পাঠ্যস্বাতন্ত্র্যবাদকে অনায়াসে ডিঙিয়ে, আমরা পৌঁছলাম এসে পাঠক্রিয়ার অবাধ স্বেচ্ছাচারিতায় ; লেখকের হিসাবি অভিভাবকত্ব থেকে ছিনিয়ে আনা পাঠ্য এখন পরিত্যক্ত, তাই অবলীলায় নিমজ্জিত, হল অনিশ্চিতের নৈরাজ্যে। এভাবেই রুচি, অন্তর্দৃষ্টি এবং মনোনিবেশের ক্ষমতা বা তাদের অভাব যার যেমন, তার সঙ্গে সংগতি রেখে চলতে থাকবে পাঠক্রিয়া, নিরন্তর উৎপন্ন হতে থাকবে তাৎপর্ষ্যের নব নব হিং-টিং-ছট। আরো যা বড় কথা, খাঁটি বা মৌকি, অনুসন্ধানী বা দায়িত্বহীন, সব পাঠক্রিয়াকেই বৈধতা দিতে আমরা কার্যত বাধ্য থাকব। ঘোষক পাঠক্রিয়াসমূহের উদ্যোগেই কেবল তাদের বাচাল প্রতিনিধিত্বের মারফৎ, মূক পাঠ্যকে শোনা যাবে উক্ত হতে ; ধরে নিতে হবে, নাবালক পাঠ্যের মূখে যা ফোটে, বা ফোটে না, তা হল 'অনিভ্যক্তবর্ণা ধর্মানিমাণরূপা পরা' বা বড় জোর 'পশ্যন্তী',

পাঠ্যক্রমের মধ্যস্থতায় তা হয়ে ওঠে 'বিবিধ জ্ঞানপ্রকাশিকা সম্ব্যবহারপ্রদর্শিকা চতুর্থী ভাষা—বৈখরী'। এরকমই দাঁড়াল তাহলে অভিযোগের চেহারাটা।

প্রথমেই স্বীকার করে নেওয়া যাক যে আমাদের অবস্থানে অনিশ্চয়তার একটা ঝুঁকি থেকেই যায়, যদিও তা যে তাত্ত্বিক নৈরাজ্যের সমার্থক এই অভিযোগটি মেনে নেওয়া গেল না। অবশ্য নীরঞ্জন, নিশ্চল পাঠ্যের ধারণাকে মেনে নিলে— অর্থাৎ যদি ধরে নেওয়া যেত যে এ জাতের পাঠ্য আদৌ আছে অথবা পাঠ্য মাত্রই নীরঞ্জন ও নিশ্চল— ঝুঁকিটা আর থাকত না তখন। পাঠ্যই যেহেতু এই বিচারে তাৎপর্যের একমাত্র জনক ও আশ্রয়, পাঠ্যশরীরে তা ওতপ্রোত থেকে যেত; এবং তার নিবিষ্টতার তত্ত্বের সঙ্গে মিল রেখে দাবি করা চলত যে পাঠ্য এবং পাঠ্যক্রমের সন্ধিদেশ বা উভয়মুখে নয়, নিরবকাশভাবে পাঠ্যশরীরে বোপে, তবে তার অভ্যন্তরেই কিস্তি, তাৎপর্য চুইয়ে পড়ছে অথবা জমাট বেঁধে ভাসছে। পাঠ্যক্রমের কাজ হত এবার তাহলে তন্নতন্ন করে খুঁজে ও ছেঁকে পাঠ্যের অন্দর থেকে পঠনের সদরে তাকে হাজির করা। পাঠ্যক্রমের তাত্ত্বিক প্রস্তুতি কতটুকু, কোন্ মতাদর্শগত বোঁক তাগিদ দিয়ে তাকে পাঠ্যের অভিমুখে প্রেরিত এবং তার সঙ্গে আশ্বিত করছে—এসব প্রশ্ন পড়ে থাকত সমস্যাপটের বাইরে।

সমস্যাপটের বাইরে, সূত্রায়ণ অনৈতিহাসিকতার হিমঘরে। নীরঞ্জন পাঠ্যক্রমকে একমাত্র এভাবেই কিস্তি বিশ্বজনীন বৈজ্ঞানিকতার আদল দেওয়া যেত। পাঠ্যক নিশ্চয় খেয়াল করেছেন, এটা হল দৃষ্টবাদী বা ধ্রুববাদী তত্ত্বপ্রকল্পের একটি প্রচলিত রণকৌশল। অদ্রাস্ত পঠন সেক্ষেত্রে হত একটি এবং তা হত বিকল্পপর্যিত; তার নির্বিকল্প আধিপত্যের মধ্যে চিরকালের জন্য ধরা পড়ে যেত পাঠ্য-নিঃসৃত তাৎপর্যের শাস্বত সারাৎসার।^৬ প্রতিটি পাঠ্য ব্যক্তি প্রাতিশ্রবক। পাঠ্যক্রমের বৈজ্ঞানিকতার বাবদে—তর্কের খাতিরে দাবিটি মেনে নিয়ে বলছি—যার মধ্যে তার তাৎপর্যটি মূর্ত বা উক্ত হত, অর্থাৎ একক এবং বৈধ প্রতিনিধিত্বের দাবি রাখত তদ্-গত যে গঠনটি, অন্য অধস্তন পঠনদের নায়ক ও সেনাপতি, সে-ও সেক্ষেত্রে হত একমেবান্বিতীয়ম্। (পুনরুদ্ধার হলেও, স্ট্যালিনবাদের উল্লেখ কি এক্ষেত্রে নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক হবে?)

একজন সং, মেধাবী এবং পরিগ্রামী পাঠকের দ্বারা—আদর্শ সমালোচকই বলা যাক তাঁকে—পাঠ্যের এই বিচারে সুনির্দিষ্ট, অদ্রাস্ত এবং নির্বিকল্প তাৎপর্যটি ধরা যাক ছেঁকে নেওয়া হল একবার। পাঠ্যের চার দেওয়ালের মধ্যে তাৎপর্যের ঘটনা বা মজদুত থাকবার কথা তা যেহেতু ঐ একমাত্র বৈধ পঠনের মধ্যে গৃহীত হয়ে গিয়েছে, পরবর্তী অন্য কোনো পাঠ্যক্রমের নতুন করে করবার কিছু থাকত না আর; তা পর্যবসিত হত চর্চিত্রের নিছক চর্চণে। স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে যে, হ্যাঁ, প্রতিটি পাঠ্যই সৃষ্ট হয় ব্যক্তি ও ইতিহাসের যৌথ উদ্যোগে, কিস্তি পাঠ্যক্রম থেকে যায় নিজ ইতিহাসের সঙ্গে নিঃস্পর্ক, তাই সেখান থেকে ফেরারি। ডক্টর জনসন কিভাবে শেক্সপীয়র পড়েন, কেনই বা; কোলরিজের পঠনেরই বা ঐতিহাসিক যুক্তি এবং চরিত্রটি কী;

নারীমুক্তি আন্দোলনে আজ যাঁরা সান্নিধ্য নিয়েছেন তাঁরা বা আমরা তৃতীয় বিশ্বের কালো মানুষজনই বা তাঁকে কিভাবে পড়ব, কোন যুক্তি মেনে; —এই বিচারটি মেনে নিলে এসব প্রশ্ন অবাস্তব হয়ে পড়ত। বস্তুত তাৎপর্য যে সর্বাঙ্গীণভাবে পাঠ্যগুরুত্বই নিহিত— পাঠ্য-নিবন্ধিতার এই তত্ত্বকে মেনে নিলে, একটি কায়দা, শাসক পঠন ব্যতীত, ভিন্ন ভিন্ন মূল্যবান পঠনের, তাদের ভিন্নতার, বৈধতাই যেত হারিয়ে। অধস্তন পঠন যে থাকত তা নিশ্চিত, সংখ্যায় তারা কিছু কম হত না, তবে তা কেবল মূল গায়নের দোহার হিসেবে।

কিন্তু এটাও তো না মানলে চলছে না, প্রতিটি জরুরি পাঠ্যের ক্ষেত্রেই দেখা যাবে যা সত্য, অধস্তন নয় এমন নানা পঠন তৈরি হয় ও তা হচ্ছে। আবার এটাও তো সত্য নয়, উপরের অনুচ্ছেদগুলিতে যে দাবিটি রাখা হয়েছে, এসব নানা পঠনের মধ্যে একটি ছাড়া বাকি সবকিছুই হয় পুনরুদ্ধার, নয় বৈধিক। করুণ হলেও পরিহাসের কথা বরণ এটাই যে পাঠ্যের যদি মতাদর্শগত এবং তাত্ত্বিক গুরুত্ব থেকে থাকে— স্থায়ী এবং মাস্টার্স তত্ত্বকাশের ক্ষেত্রে যা রয়েছে যথাক্রমে বাইবেল এবং ডাস ক্যাপিটালের —অনেক সময়েই, ক্ষেত্র বিশেষে, পুনরুদ্ধার হয় তাদের প্রতিটির সেই বিশেষ পঠনটি যা গ্রাহ্যত বৈধিক, নিদেনপক্ষে ধোঁয়াটে ও নিবোধ। এইভাবে, গিজার পিতাদের কুপায় বাইবেলে অন্তর্ভুক্ত শারীরিক কামনার সেই সুপ্রসিদ্ধ গাথাটি অর্জন করে এক আজব এবং আজগুবি অশরীরী আধ্যাত্মিক তাৎপর্য। তবে কেন এটা ঘটে তার কারণ বোঝা কিন্তু কঠিন নয় : চতুরভাবে নির্বাচিত পঠনটিকে পুনরুদ্ধার মাধ্যমে কায়দা করে তোলাই হল প্রাতিষ্ঠানিকতার অভিজ্ঞতালব্ধ একটি সুপ্রাচীন কৌশল। নিখাদ এবং সাঁচ্চা পঠন যে আছেই আছে এবং তা একটি বৈদ্যুতিক নয় এবং শাসক পঠনটির দাবিটি যে সার্বভৌম— জনমানসে দৃঢ়মূল এরকম একটি অপরিহার্য কু-সংস্কার থেকেই অবশ্য নিজের সমর্থনে বৈধতা আদায় করে প্রাতিষ্ঠানিকতা ; এবং তার আগ্রাসন কমবেশি নাকচ করে অন্যান্য পঠনের গড়ে ওঠবার দাবি।

মেকি এবং ফাঁকি বাজ পঠন অবশ্য আছে, তারাই হয়তো সংখ্যায় বেশি। তা বলে এটা তো ভুল না যে প্রতিটি তত্ত্বকাশের নীচেই এমন অনেক পঠনের খোঁজ মিলছে, মতাদর্শগত ঝোঁক তাদের যাই থাকুক না কেন, চটজলদি বাতিল যাদের করা কোনো মতেই সম্ভব নয়। পাঠ্য এক হলেও মূল্যবান পঠন সংখ্যায় অনেক কেন, এ ব্যাপারে বুদ্ধিতে গেলে আমাদের মাথায় রাখতে হয় পাঠ্যক্রিয়ার চরিত্রটি ; বুদ্ধিতে হয় কিভাবে, দেশে ও কালে, নিজ নিজ ইতিহাসের যুক্তি ও তাগিদ মেনে, সম্পন্ন হচ্ছে বিবিধ মেধাবী পাঠ্যক্রিয়া, বিবিধ পঠন ফলে অর্জন করছে তাদের ঐতিহাসিক সুনির্দিষ্টতা। উপরন্তু এটাও ঠিক যে পাঠ্যক্রিয়া এবং পঠনের ঐতিহাসিকতার প্রশ্নটির সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে অপর একটি গুরুত্বপূর্ণ অনুসন্ধাস্ত : এক বা অনেক, বৈধিক পঠন সুনির্দিষ্টভাবেই রয়েছে। কিন্তু এমন একটি কোনো সুনির্দিষ্ট পঠন নেই, তা তাত্ত্বিক অর্থে সম্ভব নয় বলেই, যা সঠিক, তাই ইতিহাস নির্বিশেষে নির্বিকল্প, অর্থাৎ যার মধ্যে পাঠ্যের হস্তান্তরিত

অন্তর্বাস্তু বা শাসিটি চিরকালের জন্য গচ্ছিত রয়ে গেছে। তা যদি হত, তাহলে দাবি করা চলত যে পাঠ্যব্যক্তির দ্বিতীয় বা বিকল্প অংশ সে— তা এতদূর পর্যন্ত যে পাঠ্য গায়েব হলে, লুপ্ত পাঠ্যের হয়ে হাকিমের সামনে সাক্ষ্য দেবার অতীকৃত অধিকার থাকত একমাত্র তার : সোহং।^৭

বৈঠক নয়, একই পাঠ্যের এসব পঠন সংখ্যায় অনেক এই সহজ কারণেই যে তারা চরিত্রে ঐতিহাসিক, তাই নিজ নিজ উদ্ভবের যুক্তি মেনেই পৃথগ্ন। আবার একই সঙ্গ, উদ্ভবের ঐতিহাসিক তাগিদগুলির মধ্যে পার্থক্য থাকলেও তাদের চটজলদি বাতিল করা সম্ভব হচ্ছে না এই কারণেই যে এদের গড়ে তুলেছে ভিন্ন ভিন্ন পাঠক্রমের সজাগ ও মেধাবী নৈতিকতা : তাদের আভিমুখ্য, ব্যাপ্তি এবং বস্তুবিবেক। পরিশ্রমী আভিমুখ্য পাঠক্রমকে ঠেলে দিচ্ছে পাঠ্যের আভিমুখে ; অভিনিবিশ্ট ব্যাপ্তির তাগিদে পাঠ্যের সম্মুখীন হয়ে তার সঙ্গে ব্যাপ্ত হচ্ছে তা ; অবশেষে, তা হবার সময়টিতে, তার মধ্যে কার্যকর হয়ে উঠছে যাকে অভিহিত করা হল বস্তুবিবেক বলে। কোন্ কোন্ অন্তর্বাস্তু বা অনুপদ্রুত পাঠ্যের মধ্যে আছে, তা কিভাবে ও কী যুক্তি মেনে, এবং কোন্ কোন্টি তা নেই, অর্থাৎ কোন্টি বস্তু, কোন্টি অবস্তু — এই উৎকর্ণ অন্তর্দৃষ্টি হল পাঠক্রমের বস্তুবিবেক। এসব গুণসম্মিপাত তাকে দিচ্ছে তার মেধা ও নৈতিকতা।

এসব আদর্শ কার্যকর বলেই, না, পাঠ্য থেকে দূরে নিজ নিজ চিদাকাশে নয়, পাঠ্যের উত্থানভূমিতে নেমে, সরজমিন, অর্থাৎ পরিপাঠ্যের মধ্যে স্থাপিত করে, তাকে বাজিয়ে বদলে দেখবার ও শোনবার আগ্রহ থেকে যাচ্ছে এসব পাঠক্রমের মধ্যে। ভাষাব্যবহারে কিঞ্চিদধিক পদলিসি প্রভাব নজরে পড়বে কি যদি বালি, পাঠ্যকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জেরা করে তদন্ত করবার পরিশ্রমেও তারা পেছপা নয় ? বৈয়াকরণের মতে, বাক্যের স্তরে শব্দবোধকে সম্পূর্ণতা দেয় পদসমূহের মধ্যে কার্যকর পারস্পরিক আকাঙ্ক্ষা। কার্যকর সূত্র হিসাবে ধারণাটিকে মনে হয় সামগ্রিকভাবে পাঠ্যের স্তরেও উন্নীত করা সম্ভব। সভাবনাটিকে মাথায় রেখে বলা চলে, দৃশ্যত উপস্থিত, সবাক যেসব অনুপদ্রুত রয়ে গিয়েছে তাদের তো বটেই, প্রয়োজনে, নজরের বাইরে তার নিশ্চতন থেকেও, পাঠ্যের স্তরে কার্যকর আকাঙ্ক্ষার সূত্রটি মেনেই, পাঠক্রম অধ্যাহার করে নিচ্ছে যা যা উহ এবং তাদের জায়গা করে দিচ্ছে নিজের বা নিজেদের ধ্যানে গড়ে তোলা ঐ সামগ্রিকেরই অবয়বে। তা পাঠ্যের অবয়ব ঠিকই, কিন্তু তাকে গড়ে তুলছে, নিজেদের উদ্ভবের ঐতিহাসিক ভিন্নতাকে মেনে, পাঠক্রমের ভিন্ন ভিন্ন ধ্যান।^৮ সাক্ষাৎকারের এই উভমুখে, ব্যাপ্ত হবার সন্ধিদেশে, পরস্পরের দ্বারা অন্তঃপ্রবিষ্ট পাঠ্য এবং পাঠক্রমের দুটি ঢাল বেয়ে, দুর্দিক থেকে এসে সূত্রাং যুক্ত হচ্ছে মনন এবং অভিপ্রায়ের দুটি পরিচ্ছন্ন ইতিহাস ; এবং এই আশ্লেষের পরিণতিতে, পাঠ্যবিহারের শেষে, উদ্ভবের ঐতিহাসিক তাগিদ ও যুক্তি মেনে, জাত হচ্ছে বিশেষ বিশেষ পঠন। একমাত্র বৈধ পঠন তা বা তারা নিশ্চিত নয় ; বস্তুত বিশ্বজনীন বৈজ্ঞানিকতার দাবিও তারা রাখছে না। কিন্তু অপর একটি কায়মি শাসক পঠনের নামে, অবৈধ এই অজুহাতে, তার

তার ঐতিহাসিকতার যদ্বিক্তিকে খারিজ কোনোভাবেই করা সম্ভব হচ্ছে না।

পাঠক্রিয়ার— এবং পঠনেরও— চরিত্র সম্পর্কে দৃ-একটি যা মস্তব্য করা হল এতক্ষণ তাতে ক'রে মনে হয় না যে তার, বা তাদের, মধ্যে কার্যকর উভ-বলতার আদর্শটি খুব একটা প্রাঞ্জল হয়েছে। পাঠক্রিয়ার নৈতিকতার প্রসঙ্গটি আগেই উত্থাপিত হয়েছে। উক্ত তাগিদটি তাকে উদ্ভুদ্ধ করেছে যাতে করে প্রাণপাত করেও সে, বা পঠন, তাত্ত্বিক স্বচ্ছতা অর্জন করতে পারে। পাঠ্য তার বিষয়; তাতে তদ্গত, অর্থাৎ লীন, হলে তবেই কেবল এই স্বচ্ছতা তার, এবং পঠনেরও, করায়ত্ত হবে। কিন্তু সাংস্কৃতিক দৃশ্যমানতা না হারালে এটা কিছূতেই হবার নয়। তা সে, বিশেষত পঠন, হারাবে,— নিজের ওপর প্রতিটি তন্নিষ্ঠ পাঠক্রিয়ার এটাই চূড়ান্ত দাবি। পরিণতির তাত্ত্বিক সীমাতে এসে এই তার আত্মোৎসর্গ।

একই সঙ্গে কিন্তু বিষয়ী হিসেবে এটাও মেনে নিতে হচ্ছে যে, পিছন দিকে, নিজের উদ্ভবের ইতিহাসের মধ্যে তার শিকড় গাড়া, অসহায়ভাবে সেখানে সে প্রোথিত। এটা ঠিক যে তার অভিমুখ তাকে প্রেরিত করেছে সামনে, বিষয়ের দিকে, এবং তার সঙ্গে কিনা, সে ব্যাপ্তও হচ্ছে সে। তাই বলে নিজের উদ্ভবের জন্মটুকু থেকে কোনো মতেই নিজেকে উন্মূল করা তার পক্ষে সম্ভব নয়। এটা সে টের পেয়েছে আলোচনায় আমরা পরে যাচ্ছি। কিন্তু এই হল পাঠক্রিয়া এবং পঠনের উভ-বলতা, তাদের মধ্যে কার্যকর দো-টানা। এক দিকে, তাদের অভিমুখ, তন্নিষ্ঠা, পাঠক্রিয়ার নিজের ওপর ন্যস্ত নৈতিকতার তাগিদ; অন্য দিকে, এই সম্ভাব্য আত্মোপলব্ধি, ফলত স্বিধান্বিত অচরিতার্থতার বোধ, যে তার উদ্ভবের ঐতিহাসিকতা তাকে বর্ণাঢ্য, তাই অনচ্ছ ও দৃশ্যমান করে রেখেছে। যা বর্ণাঢ্য, অন্য প্রেক্ষিত থেকে দেখলে তা-ই তো আবিল। ফলে পঠনে মনোযোগ দেবার সময়ে তাকে পেরিয়ে শুধু পাঠ্যই চোখে পড়ছে না আমাদের, পাঠ্যের সামনে বর্ণাঢ্য আড়াল গড়ে তুলে সে নিজেও দৃশ্যমান হয়ে উঠছে। ঐতিহাসিক আবিলতা সম্ভব ক'রে তুলছে পঠনের ভিন্নতা।

এইভাবেই তাহলে তন্নিষ্ঠ পাঠক্রিয়া এবং যা তার উদ্দিষ্ট সেই পাঠ্যের মধ্যে মাথা উঁচু করে দাঁড়াচ্ছে আড়াল, সম্পূর্ণ অনচ্ছ না হলেও পুরোপুরি স্বচ্ছ যা নয়। এক দিকে, তার ঐতিহাসিকতা, উদ্ভবের যদ্বিক্তি ও তাগিদ; অন্য দিকে, তার অভিমুখ, নিজেকে ডিঙিয়ে উদ্দিষ্টে বিলীন হবার নাছোড় গোঁ। উভ-বলতা ব'লে যাকে অভিহিত করা হল, তা হল স্ফুটন পাঠক্রিয়ার, এবং পঠনেরও, মধ্যে সক্রিয় এই দো-রোখা ঝোঁক। উদ্ভবের দিকে পিছন-টান থেকে যায় বলেই, তন্নিষ্ঠা সত্ত্বেও কোনো পঠনই পাঠ্যের মধ্যে এতটা লীন হতে পারে না যাতে ক'রে নিজের ঐতিহাসিকতাকে ধুয়ে মূছে পুরোপুরি অনাবিল হওয়া সম্ভব হয় তার পক্ষে। তবে তাত্ত্বিক সীমা হিসেবে এই প্রার্থিত আত্মোৎসর্গের সাংস্কৃতিক তাৎপর্যকে উপেক্ষা করা ভুল হবে। কেন, সে আলোচনায় প্রবেশ করছি পরে।

মূল্যবান পাঠ্যের ভিন্ন ভিন্ন মূল্যবান পঠন যে গড়ে উঠছে তার একটি কারণ তাহলে

এই যে পাঠ্যের প্রতি ঐকান্তিক তন্মিতা সত্ত্বেও নিজেদের ঐতিহাসিক উদ্ভবের তাগিদ থেকে তারা কখনো এবং কোনো মতেই বিষদ্বন্দ্ব হতে পারে না। কিন্তু শুধুই কি পাঠ্যক্রমের ঐতিহাসিকতা, তাদের উদ্ভবের ভিন্ন ভিন্ন মতাদর্শগত আবিলতা? না কি তার অপর গুরুত্বপূর্ণ কারণটি হল পাঠ্যের আত্ম-দীর্ঘতা, তার ভিতরে গড়ে ওঠা তাৎপর্যের নানা থাক? পাঠ্য অনেকান্ত ও বহু-তল, তা ভেদাচিহ্নিত, নিজের সঙ্গে ছেদহীনভাবে অন্বিত নয়। যে কাঠামো তার অন্তর্বস্তুকে সংগঠিত করে তা অসমতল এবং স্তরবিন্যস্ত। শুধু বদনের মধ্যে ফাঁক-ফোকর বা রন্ধ্র নয়, পাঠ্যক্রম চলাকালীন বা আমরা জুড়ে জুড়ে এগোই, এর খাঁজে-ভাঁজে ও পরতে পরতে রয়ে গিয়েছে নানা বিরুদ্ধ প্রত্যয় ও তাগিদ; নি-টোল, নি-খুঁত নয়, নানা মতাদর্শগত দ্বন্দ্বের দ্বারা পাঠ্য তাই বিদীর্ণ। পাঠ্যক্রমের ঐতিহাসিকতা পঠনকে যে ভিন্নতা দেয়, তা নিশ্চিত। তবু, মনে হয়, তা ততটা নয়, পাঠ্যের আত্ম-দীর্ঘতা, তার আভ্যন্তরীণ নানা-রোখ টান যতটা গড়ে তোলে তার বহুমাণিক উদ্ভবকে।

পঠন যে বিবিধ তার অপর প্রধান কারণ সুতরাং এটাই যে তাৎপর্যের এই উদ্ভব বহুমাণিক, তাই কোনো একটি সার্বভৌম পঠনে, তার যত না কেন বিস্তার ও আগ্রাসন থাকুক, তা জন্ম, অর্থাৎ অধিকৃত এবং বাজেয়াপ্ত, হবার নয়। পাঠ্যক্রমের তাগিদ ও চরিত্র সাপেক্ষে, পাঠ্যের ফাঁকফোকর দিয়ে, নানা রকমফের নিয়ে, তাৎপর্য ধরা দেয় ভিন্ন ভিন্ন পঠনে। প্রায় কোনো দুটি গুরুত্বপূর্ণ পঠন তাই অবিকল এক নয়। নব নব পঠনে, নিজেকে বারে বারে ছাপিয়ে, ধরা দিচ্ছে তাৎপর্য; ফলে গড়ে উঠছে তার উদ্ভব। নিজেকে উপচে ওঠবার এই ক্ষমতা রাখে বলেই কোনো মূল্যবান পাঠ্যই নিজের সঙ্গে পুরোপুরি অন্বিত, বা সম-বিস্তৃত, নয়।

আমাদের আলোচনার মন্থটিকে একটু ঘুরিয়ে দেখা যাক কিভাবে পাঠ্যক্রমের ঐতিহাসিকতা যেমন গড়ে তোলে পঠনের ভিন্নতাকে, মতাদর্শগত পালাবদলের বাঁকে বাঁকে যার ফলে সঞ্জীবিত হতে থাকে একই পাঠ্য, ভিন্ন ভিন্ন পঠনও তেমনি গড়ে তোলে ভিন্ন ভিন্ন পাঠ্যকে। এরা উত্তর-পাঠ্য। যে কোনো পঠন পাঠ্যের দিকে আমাদের মনোযোগ আকৃষ্ট করে মাত্র; নিজে অদৃশ্য থেকে পাঠ্যকে চিনিয়ে দিয়েই সে দায়মুক্ত। পাঠ্য হিসেবে গড়ে ওঠবার, ফলে সাংস্কৃতিক দৃশ্যমানতা অর্জন করবার, কোনো আগ্রহ তার নেই। আমরা যাদের পাঠ্য বলছি, স্বভাবতই, তাদের কাছে এই নীরব আত্মোৎসর্গ আশা করা ভুল হবে। ভিন্ন ভিন্ন প্রাক-পাঠ্য এদের পোষক কেননা পরজীবী উত্তর-পাঠ্য কিয়দংশে এদের কাছ থেকেই জোগাড় করে নেয় নিজেদের তাত্ত্বিক পুষ্টি। এবং তা করবার সময়ে নীরবে হলেও, তাদের মধ্যে সক্রিয় থেকে যায় পোষক প্রাক-পাঠ্য বিষয়ে অনুগত বা প্রতিবাদী কোনো না কোনো পঠন। সুতরাং, দৃশ্যমান বা অদৃশ্য বহিঃস্রাব বা অন্তর্লীন, কোনো না কোনো পঠন থাকছেই, তা বলে পঠন নিজে স্বাশ্রয়ী কোনো পাঠ্য নয়; তা হয়ে ওঠবার প্রবল কোনো আগ্রহ তার মধ্যে কার্যকর নয়।

প্রতিটি জাতীয় সাহিত্যে—প্রাচীন, মধ্য এবং আধুনিক যুগে—পোষক হিসেবে বিশেষ করে পদ্যরূপের এই ভূমিকাটি লক্ষ্য করার মতো। তবে অনুলোম এবং প্রতিলোম ভেদে—অর্থাৎ প্রাক্-পাঠ্যের তাত্ত্বিক ন্যায়কে তা কি অনুমোদন করছে, তাই বজায় রাখছে, না কি প্রতিবাদে তার যুদ্ধির বিরুদ্ধেই সে নিজেকে গড়ে তুলছে—উত্তর-পাঠ্যকে আবার দুটি বর্গে সাজিয়ে নেওয়া যায়।^{১০} সংখ্যায় খুব কম হলেও তৃতীয় একটি বর্গের কথাও উল্লেখ করা যেতে পারে। সেক্ষেত্রে, নানা উত্তর-পাঠ্য থেকে পিছন থেকে যাত্রা শুরু করে প্রাচীনতম প্রাক্-পাঠ্যে—প্রজ্ঞ-পাঠ্যেই বলা যাক তাকে—যখন পেঁছাই আমরা, অবাক হয়ে লক্ষ্য করি তার তাত্ত্বিক ন্যায়ের তাৎপর্যটিই পরবর্তী কালে হারিয়ে গিয়েছে। এই সাংস্কৃতিক স্মৃতি-ভ্রংশের একটি চমৎকার উদাহরণ হল কার্লিদাসের বিরূপোবংশীয়, যার প্রজ্ঞ-রূপটি ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলে ধৃত হয়েছে একটি রহস্যময় সংক্ষিপ্ত সংলাপে। কোশাম্বি দেখিয়েছেন কিভাবে কার্লিদাসের কাব্যে রূপান্তরিত হবার অনেক আগেই তার গদ্য এবং নির্মম আদিম ঐতিহাসিক যুদ্ধি এবং স্মৃতিটিকে খুঁইয়ে বসে আছে কাহিনীটি। বস্তুত স্মৃতিটি তার ঐতিহাসিক তাৎপর্য নিয়ে টিকে থাকলে মহাকাব্য পাঠ্যটি রচনা করতেন কি না তা সন্দেহের বিষয়। সমগ্র এবং অনুগ্রহ, অর্থাৎ দেশ এবং কাল বা চারপাশের অনুভূমিক বিস্তার এবং কালানুগ ধারাবাহিকতা—এই দুটি অক্ষ বরাবর গড়ে ওঠে সব পাঠ্য। প্রতিটি পাঠ্য আবার এক একটি বা অনেক সময়ে একই সঙ্গে একাধিক পাঠ্য পরিবার বা গোত্রের মধ্যে অবস্থিত। অন্তর্ভুক্তির ন্যায় রচনা করে বর্ণীকরণের প্রায় একটি বিশ্বজনীন কাঠামো তৈরি করেছেন নরথপ ফ্রাই, পাঠকের হয়তো তা মনে পড়তে পারে। কিন্তু আমরা সে আলোচনায় প্রবেশ করছি না। সমগ্রের অক্ষ বরাবর প্রতিটি পাঠ্য চার-পাশে তার নিজের প্রজন্মের অপরাপর সহযোগী বা প্রতিযোগী পাঠ্যের সঙ্গে অনুমোদন বা বিরুদ্ধতার ন্যায় গ্রন্থিত। অন্য দিকে, অনুগ্রহের অক্ষ বরাবর প্রজন্মের পর প্রজন্ম ডিঙিয়ে বয়ে চলে পাঠ্যের পরস্পর। এ ভাবেই গড়ে ওঠে নানা পাঠ্য গোত্র। জেন্‌এয়ারকে লিভিস দলছুট বা উদ্ভট বলেছেন ঠিকই, তা বলে এটা সত্য নয় যে পাঠ্যটি অন্য সব পাঠ্যের সঙ্গে সম্পর্ক-চ্যুত, তাই বিবিক্ত। এ পাঠ্যসংসারে এমন কোনো পাঠ্য নেই যা এই চূড়ান্ত অর্থে উদাসীন, তাই সংসার-বিবাগী।

প্রতিটি প্রাচীন পাঠ্যই, তা যত না কেন দলছুট মনে হোক, যেমন কোনো না কোনো পরবর্তী পাঠ্যের প্রাক্-পাঠ্য, বা পাঠ্য-গোত্রের প্রবর, একই সঙ্গে পরস্পরের বিচারে তা আবার পূর্বতর কোনো না কোনো প্রাক্-পাঠ্যের উত্তরসূরি। তাই দেখা যায়, রামায়ণ, মহাভারত, বাইবেল, হোমারের কাব্য, এমন কি গিলগামেশের পদ্যরূপের তল থেকে উঁকি মারছে এইসব প্রজ্ঞ-পাঠ্যের প্রায় অবলম্বিত সাংস্কৃতিক স্মৃতি। ভাবাদর্শগত বশ্যতার কারণে, বলা হয়েছে, অনুলোম উত্তর-পাঠ্য মেনে নেয় প্রাক্-পাঠ্যের তাত্ত্বিক ন্যায় : রামায়ণের তাত্ত্বিক ন্যায়কে রদবদল সহ পল্লবায়িত করে উত্তররামচরিত, যোগবাশিষ্ঠ, অধ্যাত্ম-রামায়ণ, রঘুবংশম্, কৃষ্ণবাসী রামায়ণ, রামচরিতমানস, অসংখ্য যাত্রা, পালা, নাটক ; সাহিত্যের

বাইরে তার জের এসে পড়ে চিত্র, ভাস্কর্য, নৃত্যগীত এবং চলচ্চিত্রে। ঠিক বিপরীত কারণে ঐ ন্যায়কেই কমবেশি ভাঙে প্রতিলোম উত্তর-পাঠ্য : ইক্ষ্বাকু-কুল-সম্ভূত নরচন্দ্রমা, যার সাংস্কৃতিক স্মৃতি আজকের ভারতবর্ষে সব চাইতে ভয়াবহ অভিশাপ হয়ে দাঁড়িয়েছে, সতীনাথ ভাদুড়ীর হাতে হয়ে ওঠেন একজন অচ্ছদ্র তাংমা। তুলনীয়ভাবে, রামকাহিনীর প্রেক্ষিতটি অনেকাংশে পাণ্ডে রাবণকাহিনী করে না নিলে মাইকেলের কাব্যটি সম্ভব হত কি? এই প্রক্রিয়াটির ফলে, অনুভূমিক অক্ষ বরাবর পাঠ্য থেকে পাঠ্যান্তরের বদন গড়ে তোলে সমক্রমকে; অন্য দিকে, কাল থেকে কালান্তরে পাঠ্য পরস্পরের ঢাল বেয়ে, অনুক্রমের অক্ষ বরাবর চালু থাকে বশ্যতা ও প্রতিরোধের বাদ-প্রতিবাদ।

প্রাক-থেকে উত্তর-পাঠ্য গড়ে ওঠবার প্রক্রিয়াটির নানা রকমফের। ক্ষেত্রবিশেষে তা কতটা জটিল হতে পারে, কেন্দ্রীয় নয় এরকম কয়েকটি পাঠ্যের সাহায্যে সে ব্যাপারে দু-একটি ইঙ্গিত দেবার চেষ্টা করা যেতে পারে। চীনা বাঁদর পুরাণটি যাঁরা পড়েছেন তাঁরা জানেন যে মূলত লোকায়ত কাহিনীর পিছনে কাজ করছে ইউয়েন চ্যাঙের ভারত-ভ্রমণের স্মৃতি। এবং পাঠ্যের আরো তল দিয়ে, ক্ষণিকের ভাবে, প্রতিধ্বনিত হচ্ছে রামায়ণের হনুমান কাহিনীর স্মৃতি। চীনা প্রেক্ষিত থেকে দেখলে বলা চলে, যে দেশে বেড়াতে গিয়েছিলেন উক্ত ভ্রমণটি সেদেশের পুরাণ থেকে কিস্যদংশে খুঁজে পাওয়া গিয়েছে বাঁদর চরিত্রকে। কিন্তু যে পাঠ্যের পিছনে প্রাক-পাঠ্য হিসেবে তা সক্রিয় থাকছে, যার মধ্যে তা উক্ত হচ্ছে, মার্গ সাহিত্যের বনেদী বন্ধ গঠন নয়, তাকে গড়ে তুলছে খাঁটি দেশজ এবং লোকায়ত আখ্যান আদর্শ; ফলে তার কাঠামোর মধ্যেই থেকে যাচ্ছে অনর্গলতার, নিজেকে বারোবার ভেঙে অনবরত ডিঙিয়ে যাওয়ার ঝোঁক। উপমহাদেশ ব্যোপে তাই তৈরি হচ্ছে একই কাহিনীর ভিন্ন ভিন্ন পাঠ।

স্বার্থপর দৈত্যের রূপকথাটিতে খ্রীষ্ট স্বয়ং উপস্থিত। সুদীর্ঘ রাজপুত্র পড়বার সময়ে অনেকেই হয়তো খেয়াল করে দেখেন না যে এর প্রাক-পাঠ্যটি আসলে বুদ্ধ-জীবনী। হয়তো আর্নল্ডের এশিয়ার আলো বা অশ্বঘোষের বুদ্ধচরিত পড়তে পড়তে মৃদু ওয়াইল্ড ব্যাক্তি-ইতিহাসের এই পুরাকল্পটি ভেঙে গড়লেন রূপকথাটি; তা করবার সময়ে আধ্যাত্মিক প্রাক-পাঠ্যের পরিচয় সঘনো গোপন রেখে, তা থেকে তাঁকে ছেঁকে নিতে হল তার নৈতিক নিষাসটুকু। কাহিনীটির মধ্যে দু-একটি ইঙ্গিত অবশ্য রেখে দিলেন তিনি যে এর উৎস ভারতবর্ষ, বিশেষ করে মহাযান মতের অবলোকিতেশ্বরের ধারণাটি। বিহারে, হর্মিকের ওপর থেকে তিনি অবলোকন করেন ত্রিলোকের দৃষ্ট, আপলুত হন মৃদাদিত্য, করুণা ও উপেক্ষায়। রাজপুত্রের ক্ষেত্রেও কি ঠিক এটাই ঘটছে না? আর যে চোখ দিয়ে নগরের দৃষ্ট তিনি দেখছেন তা-ও তো গড়া হয়েছে সেই দুটি নীলকান্ত মণি দিয়ে যা, রাজপুত্র নিজেই জানাচ্ছেন, আনীত হয়েছে সুদূর ভারতবর্ষ থেকে। এইভাবে প্রাক-পাঠ্যের পরিচয়টি সঘনো গোপন রেখে, ইঙ্গিত-বহু কিছু ইশারার সাহায্যে, তার এবং উত্তর-পাঠ্যের মধ্যে লেখক গড়ে তুললেন একটি লুকোচুরির সম্পর্ক; ফলে

চিনেও চিনতে না পারার একটি অনুরণন ঘটে দেখা যাচ্ছে পাঠকের মনে।

এক্ষেত্রে, প্রাক্-পাঠ্য এবং উত্তর-পাঠ্যের মধ্যে যে মেজাজের ব্যবধান গড়ে উঠল, ওয়াইল্ডের বিচারে তার প্রয়োজন ছিল। কিন্তু এই প্রয়োজনটি আদৌ কেন অনুভূত হল? বুদ্ধজীবনী বলতে যা আমরা বুঝি, তাঁর এই আধ্যাত্মিক পক্ষাঙ্গমটি, মূলত হল অমনস্ক সম্পদের ঘেরাটোপ থেকে সুখী রাজপুত্রের বহির্গমন। দুঃখ থেকে মুক্তি পাবার উদ্দেশ্যে তাঁর প্রব্রজ্যা এবং অবশেষে তাঁর উত্তরণ। এই পুরাকল্পটির মধ্যে তার উত্থান-লগ্নেই, নানা উত্তর-পাঠ্যের বীজ উপ্ত হয়েছিল। জাতকের অসংখ্য কাহিনী থেকে শূর্য করে ক্ষেমেন্দ্রের বোধিসত্ত্বাবদানকল্পলতা পর্যন্ত, বা আর পরেও, সুদূর থেকে উঁকি মেরে মনে হয় নিমাই সন্ন্যাসের নানা পালার মধ্যেও, এই সব সম্ভাবনাই কি বাস্তবায়িত হয়ে উঠে না? ‘কল্পলতা’ শব্দটির মধ্যেই, পরম্পরা বেয়ে পাঠ্য থেকে পাঠ্যান্তরে, পুরাকল্পটির এই পল্লবায়নের সামর্থ্যকেই কি সূচিত করা হল না? এই পল্লবায়নেরই একটি সম্ভাব্য অন্তিম, কেবল তার নৈতিক তাৎপর্যটুকুকে মূর্ত করে গড়ে উঠল ওয়াইল্ডের কাহিনীটি।

উদ্ভবের অপর একটি যুক্তি মেনে, পল্লবায়নের অপর একটি প্রত্যন্তে এর সঙ্গে এসে যুক্ত হচ্ছে অবনন্দনাথের নালক— প্রত্যন্তে, কেননা, কাহিনীটির মধ্যে অশ্বঘোষের প্রভাব সত্ত্বেও, বৌদ্ধ তত্ত্বাকাশের তলায় ঠিক নয়, বরং হিন্দু এবং বৌদ্ধ এই দুটি তত্ত্বাকাশের উভয়দিকে, গড়ে উঠছে কাহিনীটি। কথক নালকের মূখ্য থেকে আশ্রমের শ্রোতাদের জন্য কথিত হচ্ছে বুদ্ধজীবনের ধারাবিবরণী : মণ্ডলীর কথক ও শ্রোতার অর্বোদ্ধ; আবার অর্বোদ্ধ অবনন্দনাথ তা লিখছেন সাধারণভাবে তাঁর অর্বোদ্ধ পাঠকদের জন্য। বাইরে থেকে পরিপাঠ্য যে ন্যায় গড়ে তুলছে তার চাপ এসে পেঁঁছেছে পাঠ্যের ভিতরে; তার আভ্যন্তরীণ ঝোঁকও তাই যেন অনেকটা হল, বৌদ্ধ থেকে হিন্দু, একটি ধর্মের আবেশনীয় থেকে অন্য ধর্মের তলায় এসে পেঁঁছনো। লক্ষ করুন, আশ্রমে তথাগত যখন আগত-প্রায়, মায়ের ডাক কানে এসেছে নালকের, সেখান থেকে নিঃশব্দে বিদায় নিচ্ছে সে। এরে ভিখারী সাজিয়ে কী রঙ্গ যে করা হল, ভেবে আকুল হচ্ছি আমরা।

নালককে— কিছুটা তার কাহিনীকেও হয়তো— অস্ত্রবাসী বলা চলে। কাহিনীটি বুদ্ধদেবের যতটা, নালকেরও ততটাই। সে সেই এলাকাটির বাসিন্দা যেখানে, পরম্পরের অন্তিম, হিন্দু এবং বৌদ্ধ এই দুটি তত্ত্বাকাশ পরম্পরের কাছে পেঁঁছেও বিষাক্ত থেকে যায়। এতক্ষণ যাঁদের উদ্দেশ্যে বুদ্ধজীবনী কথিত হচ্ছিল বুদ্ধদেব অর্চরে তাঁদের মধ্যে এসে পেঁঁছবেন। তার আগেই কিন্তু কথক নালকের কানে এসে পেঁঁছেছে তার মায়ের ডাক, সাড়া দিয়ে সে ফিরে চলেছে ঘরে, তার নিরাপদ হিন্দু বৃত্তে। তাই এতটা বছর বুদ্ধজীবনের ধারাবিবরণ দিলেও তাঁর সঙ্গে সরাসরি যুক্ত হবার আত্মিক সম্ভাবনা থেকে সে চ্যুত থেকে যাচ্ছে। তাই কি সে ‘ভিখারী’? এক দিকে বুদ্ধজীবনের তাৎপর্য সম্পর্কে আন্তরিক শ্রদ্ধা; অন্য দিকে, মায়ের ডাক, ঐতিহ্য-লব্ধ হিন্দু নিরাপত্তার টান — পাঠ্যের মধ্যে এই উভ-টান নজরে পড়ছে কি?

দুটি তত্ত্বাকাশের সম্বন্ধে, তাদের নিজ নিজ প্রত্যন্তে, এইভাবে যে উত্তর পাঠ্যকে স্থাপিত করা হল, তার আরেকটি কারণ এটাও নিশ্চিত যে নিজের সাংস্কৃতিক পরিপাঠ্য থেকে যে তাগিদ ও আবেগ উপচে প্রবেশ করেছিল পাঠ্যে তার উদ্ভব-মুহূর্তে, ভিতর থেকে গড়ে তুলেছিল তার ন্যায়, তার নিজের মধ্যেই সক্রিয় ছিল সুগভীর উদ্বেগ-জনিত বিহ্বলতা। রাজেন্দ্রলাল, হরপ্রসাদ, রবীন্দ্রনাথ, কুমারস্বামী, হ্যাভেল, ওকাকুরা, নির্বোধিতা— এসব নাম যে সাংস্কৃতিক আবহ এবং প্রকল্পের অনুষ্ণব বহন করে, যদি একটি কোনো সূত্রে তাদের গেঁথে দিতে হয়, সেটা তো মনে হয় এটাই হবে : বৌদ্ধ গৌরবের পুনরুদ্ধার। এর সঙ্গে, সাংস্কৃতিক অনুশীলনের সূত্র ধরে কি অবনীন্দ্রনাথের নামটিও জুড়ে দেওয়া যায় না? আমরা যে আমাদের সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার হারিয়ে আজ ‘ভিখারী’ হয়েছি, পরিপাঠ্য থেকে তাহলে সেই সাংস্কৃতিক উদ্বেগই সঞ্চারিত হচ্ছে পাঠ্যে : বুদ্ধজীবনের সূত্র ধরে গড়ে উঠছে নালকের কাহিনী।

বুদ্ধজীবনের এই পুরাকল্পটিকে যদি খ্রীষ্টীয় তত্ত্বাকাশের নীচে টেনে আনতে হয় তাহলে যে অসুবিধা দেখা দেয় তার চরিত্রটি বুদ্ধে নেবার চেষ্টা করা যাক। পরস্পরকে বোধবার ক্ষমতা বা প্রচেষ্টা দূরস্থান, অনিশ্চিত, নিঃস্পর্ক, তাই পরস্পরের প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন থাকতে দেখা গেছে বৌদ্ধ এবং খ্রীষ্টীয় এই দুটি তত্ত্ববিশ্বকে। অপরিচিতের এই ব্যবধানের ফলে, এমনকি পরস্পর সম্পর্কে বিরুদ্ধ-প্রত্যয় গড়ে তুলে—মধ্যযুগের খ্রীষ্টধর্ম এবং ইসলাম যা গড়েছিল—আজ-পরের ভেদাচহ্নের সহায়তায় নিজেদের আলাদা করে চিনে নেবার আগ্রহ পর্যন্ত এ দুটি তত্ত্বাকাশের মধ্যে কোথাও নেই; —অন্তত প্রাগাধুনিক যুগ পর্যন্ত তা ছিল না : পুরাকল্পটিকে খ্রীষ্টীয় তত্ত্বাকাশের গোচরে আনতে হলে, হয়, খোল-নলচে পালেট রঙিন খ্রীষ্টীয় ধর্মবিশ্বাসের মোড়কে সাজিয়ে নিতে হয় তাকে; নতুবা, দুটি অসম্পৃক্ত তত্ত্ববিশ্বের সম্পূর্ণ বাইরে, রূপকথার কান্তারে স্থাপিত করতে হয় তাকে। আশ্চর্যের কথা, ঠিক এটাই ঘটতে দেখা গেল আগে-পরে, এক সহস্রকের দুটি প্রান্তে।

ডামাস্কাসের পথ ধরে বুদ্ধজীবনের পুরাকল্পটি যখন ইউরোপে প্রবেশ করেছিল, সেই প্রথমবার বাল্মি এবং জোসেফাট, উক্ত সন্তস্বয়, হাজির হয়েছিলেন খ্রীষ্টানের পোশাকে। জোসেফাট নামটির তল দিয়ে যে বোধিসত্ত্ব নামটি উঁকি মারছে আমরা তা বর্ষা, কাহিনীটির প্রচারক সন্ত জন বা সিমোন থিওফ্রাসটাস তা টের পাননি। সম্ভব নেই, ব্যাপারটি হাস্যকর। তাই, বৌদ্ধ এবং খ্রীষ্টীয়, এই তত্ত্বাকাশদুটির সম্পূর্ণ বাইরে, একটি সর্বজনীন মানবিক তাৎপর্ষ্য গড়ে পিটে নিতে হবে পুরাকল্পটিকে, আমাদের দিকে, সহস্রকের নিকটতর প্রান্তে, নিজের ওপর এটাই ছিল ওয়াইল্ডের দাবি। অবিকল এক না হলেও চিত্রশিল্প বা মূর্তিতত্ত্বে তুলনীয় একটি পরিবর্তনকে প্যানোফিস্কি অভিহিত করেছেন আইকনোগ্রাফি বলে : লিম্বো থেকে আদমকে ছিনিয়ে আনছেন যীশু এবং তা অবিকল সেই ভাষাতে যে ভাষাতে, প্রাচীনতর শিল্পরীতিতে, হারকিউলিসকে দেখা যেত হেডিস থেকে সেরবারাসকে ছিনিয়ে আনতে। সে যাই হোক, পুরাকল্পটিকে ঢেলে

সাজাবার ব্যাপারে ওয়াইল্ড কতদূর সফল হয়েছিলেন সে বিষয়ে, অধ্যাপক বদ্বশরুই যেমন লক্ষ করেছেন, একটি মন্তব্যই মনে হয় যথেষ্ট হবে : স্টেটসের মতে, সূক্ষ্ম রাজপদ্র-ই হল তাঁর শ্রেষ্ঠ সাহিত্যকীর্তি ।

এই প্রসঙ্গে একটি কথা ভেবে দেখা যেতে পারে । আমি যাকে প্রাক্-পাঠ্য বলেছি, যেমন যীশুর ক্ষেত্রে বিশেষ করে প্রথম তিনটি সদুসমাচার, তার তল দিয়ে উঁকি মারতে পারে প্রাচীনতর প্রক্স-পাঠ্যের স্মৃতি । এক্ষেত্রে প্রক্স-সদুসমাচারটির বাস্তব অস্তিত্ব স্বীকার করেছেন পণ্ডিতেরা । তবে ধর্মীয় অনুবঙ্গ প্রবল বলে, প্রক্স, প্রাক্- এবং উত্তর-, সব পাঠ্যের ক্ষেত্রেই উপাদান হিসেবে খোঁজ মিলবে পদ্রাক্ষের টুকরো টুকরো নানা বা অখণ্ড একটি সামগ্রিকের । যীশুর, বা যে তত্ত্বাকাশ তাঁকে ঘিরে গড়ে উঠল তার ক্ষেত্রে উপাদানগুলি হল : ঈশ্বর-দ্রোহ, উষার পদ্র লুসিফারের স্বর্গচ্যুতি, প্রথম মানবের অবাধ্যতা ও পতন, দ্বিতীয় দেবতাব্যতির জন্ম, মৃত্যু ও পুনরুত্থান, আর্মাগেডনে শূভ বনাম অশুভ-র ভাবী মহাহব এক শেষ বিচার । পদ্রাক্ষটির মধ্যে কার্যকর এসব বা আরো নানা উপাদান খ্রীষ্টীয় ধর্মবিশ্বাসকে পিছন দিকে ঝুঁকুত করছে— নিকট-ও মধ্য-প্রাচ্যের প্রাচীনতর নানা ধর্মবিশ্বাসের সঙ্গে ; যেমন, সামনের দিকে, তারাই আবার তাকে ঝুঁকুত করে চলল পল্লবায়িত অসংখ্য উত্তর-পাঠ্যের সঙ্গে ।

সমগ্রম ও অনুক্রমের অক্ষ বরাবর, পাঠ্য থেকে পাঠ্যান্তরের ঢাল বেয়ে বিস্ময়কর স্ফীতি ও বিস্তার ঘটল মূলত অনুলোম পাঠ্যের । তারা সংখ্যায় যত অজস্র, ভাববৈচিত্র্য ও বিষয়মহিমায় ঠিক ততটাই সমৃদ্ধ । ম্যাজিক মাউন্টেনের পিটারকর্ন কি কিয়দংশে যীশুরই শিল্প রূপায়ণ বলব ? কিছটা পর্যন্ত শহিদ দেবতাব্যতির আত্মক্ষয়ী ভালবাসাকেই তো ডস্টয়েভস্কি রূপ দিলেন ইডিয়ট-এ । কেন্দ্রীয় পাঠ্যের বাইরে সরে এসে বলা যায়, আকারে এবং চরিত্রে যা বাহ্যত ধর্মীয়, ওয়াইল্ডের মতো, তার খোলস ছাড়িয়ে এই পদ্রাক্ষটিকে, অন্তত তার কোনো কোনো নির্বাচিত উপাদানকে তো রূপকথায় পরিণত করা যায় । তাঁদের নিজেদের রূপকথায় তো ঠিক এটাই করলেন ধর্মিকপ্রবর সি এস লিউইস এবং যিনি আদৌ ধর্মধ্বজী নন সেই সাঁৎ-এক্সপেরি । অথবা স্মরণ করুন হেনরি ভ্যান ডাইকের রূপকথাটি, যেখানে প্রাক্-পাঠ্যে অনুলোমিত চতুর্থ মেগাসটি, তিন মেজাই-এর পদ্রাক্ষটির বিপরীত ন্যায়, অবশেষে এসে পৌঁছলেন— তবে, না, সদ্যোজাত দ্বিতীয় দেবতাব্যতির পায়ে তাঁর উদয়ে অন্তিমিত-মহিমা প্রাচীনতর ধর্মবিশ্বাসের শেষ শ্রদ্ধাঘটিত দেবার জন্য কেবল নয় ; আতের দুঃখেমোচনে পথে বড় দৌঁড় করে ফেলেছেন তিনি । তাই প্রেম ও ভক্তিতে আপন্নত হয়ে ক্রুশে বিদ্ধ দেবতাব্যতির মৃত্যু বস্তুগার শরিক হতে এলেন তিনি । অন্য তিন মেজাই যা পারেন নি, তিনি তা পারলেন : যীশুজীবনের প্রকৃত তাৎপর্যের কাছে এসে তিনি পৌঁছলেন । অনুলোম পাঠ্য হলেও, কান পাতলে এর মধ্যে প্রাক্-পাঠ্য সম্পর্কে মৃদু অভিযোগ যেন একটা শোনা যাচ্ছে । কেননা এই নিখাদ ভক্তের কথাই তো বলা হয় নি সেখানে ।

খ্রীষ্ট ধর্মের ক্ষেত্রে, প্রাক্-পাঠ্যকে ঘিরে উত্তর-পাঠ্যের এই বিস্তার ও ঘনত্ব তুলনারহিতভাবে

সমৃদ্ধ। কিন্তু এই বিস্ময়কর সমৃদ্ধিই কি তত্ত্ববিশ্বটিকে—না, বহিরাক্রমণের ফলে নয়, ভিতর থেকেই—ভেদ-চিহ্নিত, তাই দীর্ঘ, করে তোলে না? অনুলোম পাঠ্যের অনন্ত পর্যায় তৈরি হয়েছে। তাদের চিনে নিতে নিতে কোথায় এসে থামব; বলব, না, অনুলোম পাঠ্য শেষ হয়েছে এবার, এখান থেকে শুরুর হয়েছে প্রতিলোম পাঠ্য? এবং প্রতিলোম পাঠ্যের খোঁজ নিতে নিতে কোথায় থামব, বলব; প্রতিবাদের দুঃসাহসে মরিয়া। প্রতিলোম পাঠ্যই এ জায়গাটিতে এসে আমাদের পেঁাছে দিচ্ছে তত্ত্বাকাশের বাইরে, অন্তত তার নিগমনের মুখে, বহিঃস্বারে? কদাচিৎ হলেও এরকম ঘটনা ঘটে—ফয়েরবাক পথ ছেড়ে দেন মাক্সকে : ইহ-বিমুখতার খ্রীষ্টীয় যুক্তিকে নাকচ করে গড়ে ওঠে ঐহিকতার তাগিদ ও তার তাত্ত্বিক স্বীকৃতি। বিজ্ঞানের জগতে তুলনীয় ভারবিশ্ববর্তী ঘটলে, কুনকে অনুসরণ করে বলা চলত, সব কিছুরকেই এখন ছ'কে নিতে হবে বলবান এবং উর্বর নতুন তত্ত্বপটের মধ্যে, তার যুক্তিতে।

তবে তা যদি নাও ঘটে, খ্রীষ্টীয় তত্ত্বাকাশটির মধ্যেই যদি থেকে যাই আমরা, একথা না মেনে তো উপায় থাকে না যে এত বৃহৎ দেশ ও কাল পরিধি ব্যোপে, দুহাজার বছর ধরে যা অবিরাম গড়ে উঠেছে, ব্যক্তি এবং গোষ্ঠী অভিপ্রায় যাকে বারোবারে ভেঙে পুনর্নির্মিত করে এসেছে, সেই তত্ত্ববিশ্ব তো কোনো মতেই একটি নির্দিষ্ট, স্থায়ী, ছেদহীন, গোটা একক নয়। মরুকান্তারে প্রলোভনকে জয় করে মিল্টনের যীশু মানুষের হয়ে পুনর্বাসি স্বর্গারোহণের সম্ভাবনাকে অর্জন করেন; অন্য দিকে, প্রলুপ্ত বলেই কিন্তু কাজাল্ট-জাকিসের যীশু ফিরে পান মানুষ হিসেবে তাঁর আত্মিক উত্তরাধিকার : মানুষের রিগৎসা। তত্ত্বজিজ্ঞাসার চরিত্র ও গুরুত্ব মিল্টন এবং কাজাল্টজাকিস যে নিতান্তই অসম এবং বিসদৃশ তা আমি জানি; তা-ও যে উদাহরণদুটি দিলাম তার কারণ শুধু সম্ভব হলে এটা দেখানো যে, ভিতর থেকেই, খ্রীষ্টীয় তত্ত্বাকাশ কতটা অনেকান্ত, বিরোধী সম্ভাবনা এবং আকাঙ্ক্ষার দ্বারা কতটা দীর্ঘ।

এর একদিকে, বিবিধ মূক্তিকামী প্রতিলোম পাঠ্য এবং পঠনের মধ্যে সাক্ষ্য দিচ্ছে রাষ্ট্রিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক বিধিনিষেধকে পদে পদে ভেঙে, নিজের ঐহিকতাকে অকপটে মেনে নেবার সততা ও সাহস; তাই রাষ্ট্রিক-সাংস্কৃতিক অবদমনের বিরুদ্ধে, নানা তাৎপর্য-সহ এবং নানা লয়ে, গড়ে উঠছে রেকের নানা পাঠ্য বা আমাদের সময়ে গ্র্যান্ডন বা কাদে'নালের পঠন ও পাঠ্য। এর বিপরীতে, সার্বিক অবদমনের শক্তিকে পুণ্ডিত করবার তাগিদে নিজেদের যথাসাধ্য নিয়োজিত করছে খ্রীষ্টীয় তত্ত্ববিশ্বের সবচাইতে ক্ষুরধার সব মেধা : সন্ত পল এবং সন্ত অগাস্টিন থেকে পাস্কাল এই অর্থে গড়ে তুলেছেন সর্বাঙ্গীণভাবে ইহ-বিমুখ, আত্মনিপীড়নের আদর্শে উদ্ভুদ্ধ সব তাত্ত্বিক পাঠ্য ও পঠন। একই ভাবলোকে তবে এতটা অনেক্য!

নিঃসন্দেহে, বশীভূত তাত্ত্বিক ঝোঁক ও প্রেরণাটি যে অর্থে মতাদর্শগত আধিপত্যের মধ্যে ওতপ্রোত, প্রতিবাদী প্রেরণাটি তা নয়। ফলে, যেসব প্রতিলোম পাঠ্যে দ্বিতীয় বর্গের ঝোঁক ও আদর্শগর্ভালি ব্যক্তি ও মূর্ত হচ্ছে, সামাজিক উপস্থিতির বিস্তার ও ঘনত্ব

তা অসম। টেম্পেটেশ্যন অব্ দ্য ওয়েস্ট-এর চীনা যুদ্ধকটি চিঠিতে যে বিস্ময় ব্যক্ত করেছিল তার যুদ্ধি উঠে এসেছিল এই তর্কাতীত অপ্রতিসাম্য থেকে : কেন চিত্র, ভাস্কর্য, সংগীত, সাহিত্য, লোককথায় ; কেন ধর্মবিশ্বাস, অভ্যাস ও তত্ত্বচিন্তায়, কেন তার চৈতন্যকে পরিব্যাপ্ত করে, প্রতীচ্য সভ্যতা তার উপ্যাসের বেদীতে বসায় এক ক্লিষ্ট, দৃষ্ণী দেবতাকে ? কী সে খুঁজে পায় আতীর, আত্ম-নিগ্রহের এই নিরুপম আদর্শটির মধ্যে ? গ্রুনেভাল্ড থেকে রুয়ো পর্যন্ত এই প্রেমিক হাতা-দেবতাটির যন্ত্রণা-দীর্ণ মৃৎচ্ছবির কথা স্মরণ করুন। আতীরে ঘিরে এই মহোৎসবের পিছনে কি, নীটশের অভিযোগ মাথায় রেখে প্রশ্ন করা যায়, অবদমনের নেশায় বৃন্দ হয়ে থাকা গোষ্ঠী-চৈতন্যের মর্ষকামী অসুস্থতা সাক্ষ্য দিচ্ছে না ? প্রতীচ্য ভাবলোকে, ক্রুশে বিদ্ধ দেবতাটির এই সাংস্কৃতিক কেন্দ্রস্থতার কথা মাথায় রেখেই মনে পড়েছে শ একবার তাঁর স্বভাবসুলভ তির্যক পরিহাসের সুরে কোথায় যেন বলেছিলেন : ক্রিশ্চিয়ানিটি নয়, ক্রিশ্চিয়ানিটি।

বশ্যতা ও প্রতিরোধের জটিল স্বাস্থ্যদক প্রক্রিয়ায়, নানা পর্যায়ে নানা লয়ে, ভাবাদর্শগত আধিপত্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ গড়ে ওঠে। একটা ধাপ পর্যন্ত, প্রাক-পাঠ্যের অনেকান্ত দীর্ণতার সুযোগ নিয়ে, নির্বাচিত পঠনের সহায়তায় বেছে নিজে স্বপক্ষে যুক্তি আদায় করে প্রতিলোম উত্তর-পাঠ্য। সংকটের বোধ তীব্রতর হয়, দ্রুততর হয় পরিণতি পাবার লয়টি। দীর্ণতা এবং আত্ম-বিরোধের প্রবলতর বোধটি প্রতিবাদী বোঁকগদুলিকে তাগিদ দিয়ে ঠেলে দিতে থাকে তত্ত্বাকাশটির বাইরে। এই প্রক্রিয়াটি তার চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছলে দেখা যায় তত্ত্বপটটি পরিত্যক্ত হয়েছে, পরিবর্তে গৃহীত হয়েছে বিশ্বাস, অনুভূতি ও মূল্যবোধের—অর্থাৎ মনন ও অভীপ্সার—যৌথ উদ্যোগে রূপায়িত নতুন একটি তত্ত্বপট। পরিবর্তিত তত্ত্বপটটির অনেক উপাদান অবশ্য জায়গা করে নেয় নতুন তত্ত্বপটটিতে, তবে তারা তা নেয় সংগঠক বিন্যাসের নবীনতর যুক্তি মেনে, পরিবর্তিত তাৎপর্য সহ। যা বড় কথা তা হল, নতুন তত্ত্বপটটি দেখা যায় জায়গা করে দিচ্ছে সেইসব গৃঢ়েষা এবং মূল্যবোধকে, তার উদ্ভবের আগের মূহূর্ত পর্যন্ত যা যা ছিল নিষিদ্ধ, তাই অবদমিত। অবলুপ্ত হয় বিভাজন, রেকের নরক থেকে উন্নীত গৃঢ়েষা যুক্তি পায় আপ্ত-কাম মানুুষের বেঁচে থাকবার দৈনন্দিন স্বর্গে।

স্বর্গ ও নরক সমীকৃত হবে, বিভাজিত ব্যক্তিসত্তা ফিরে পাবে তার অখণ্ডতা—এটাই ছিল রেকের প্রতিবাদী বিশ্বাস। কি খ্রীষ্ট জগতে, কি তার বাইরে, কাঙ্ক্ষিত হলেও মনে হয় না সম্ভাবনাটি খুব কিছু নিকটবর্তী। প্রতিবাদ তা বলে থেমে থাকেনি। তা তৈরি হয় ও হচ্ছে ; এবং, নিঃসন্দেহে, একটি জটিল ঐতিহাসিক প্রক্রিয়াই তাকে সম্ভব করে তুলছে। একই সঙ্গে এটাও কি ঠিক নয় যে একেবারে তার গোড়ায়, খ্রীষ্টীয় পুরাণের কেন্দ্রেই, এমন কিছু উপাদান সক্রিয় ছিল যেগুলি পূর্ন জন্মগোঁহিল এইসব প্রতিবাদী উত্তর-পাঠ্যকে ? মৃত্যুর মধ্যেই দৃষ্ণী দেবতাটির তাৎপর্য নিঃশেষিত হচ্ছে না, তাকে তিনি জয় করছেন। ফীনিজের চালু উপমাটির সহায়তায় বলা চলে নিজের ভ্রমাবশেষ থেকেই উঁখত হচ্ছেন তিনি। তল দিয়ে পুরাকল্পটির মধ্যে

ক্রিয়াশীল ঐ দো-টানাকেই আবার পুষ্টি জুগিয়েছে আরো নানা প্রজ্ঞ-স্মৃতি ও বিশ্বাস, এবং তাদের ঘিরে গড়ে ওঠা আরো নানা প্রজ্ঞ-ধর্ম। ভূমধ্যসাগরের দক্ষিণ-প্রাচ্যে মিশর থেকে একটি বৃত্ত এশিয়া মাইনর হয়ে পৌঁছল গ্রীসে : ওসিরিস থেকে ডায়োনিসাসের উপাসনাকে ঘিরে, সামগ্রিকভাবে এই এলাকাটিতেই তাহলে মৃত্যু-বিজয়ের প্রজ্ঞ-স্মৃতিটি সক্রিয় ছিল।

আমার বক্তব্য শুধু এটাই যে তল থেকে তাগিদ দিয়ে এসব প্রজ্ঞ-পাঠাই মনে হয় খৃষ্ট ধর্মের মধ্যে এনে দিয়েছিল মৃত্যু-বিজয়ের দ্যোতনা। শুধু আত্মিক মহোৎসব নয় তাহলে, পুনরুত্থান বা মৃত্যু-বিজয়ের কম্পনার মধ্যে একই সঙ্গে ঐহিকতার বোধটিও সক্রিয় ছিল, যেমন সক্রিয় ছিল তাকে স্বীকৃতির দাবি। ঐতিহাসিক পিচ্ছিলতার কারণ মেনে পাঠ্যক্রমের তাগিদ ও ভর বারে বারে সরে গিয়েছে নিশ্চিত, কিন্তু মূলত পুরাকল্পের এসব উপাদানের মধ্যে থেকেই, অবদমিত ঐতিহাসিক আকাশকে তাত্ত্বিক বৈধতা দেবার তাগিদেই তা গড়ে তুলেছে নানা প্রতিলোম পাঠ্য।

সব পাঠ্যই উত্তর-পাঠ্য। সব পাঠ্যের মধ্যেই, চূপ করে হলেও, কার্যকর থেকে যায় এক বা অনেক প্রাক্-পাঠ্য সম্পর্কে তাত্ত্বিক সায় বা আপত্তি ; এই সায় বা আপত্তিকেই বলা চলে পূর্ববর্তী ঐ ঐ পাঠ্য বিষয়ে তার তার মতাদর্শগত তবে অন্তর্লীন পঠন। উদাহরণ স্বরূপ, কার্দিদ-এ এই পঠন, তার সোচ্চার বিতর্কশীলতার সঙ্গে সংগতি রেখে, উচ্চ-গ্রাম ; অন্য দিকে, নর্দাংগার অ্যাবি-র ক্ষেত্রে পাঠ্যে প্রযুক্ত পঠনটি শ্লিষ্ট, ফলে উন-কণ্ঠ ; তাই তাকে শুনতে হলে, মনোযোগকে সংহত করে আমাদের কান পাততে হয় পাঠ্যে এবং, তাকে পেরিয়ে, কোনো কোনো প্রাক্-পাঠ্য—এক্ষেত্রে যেমন হয়তো মিস্ট্রিজ অব্-উডালফো-তে।

উত্তর পাঠ্যের অন্তর্ভুক্ত থেকে যায় সায়- বা আপত্তি-সূচক অন্তর্লীনে পঠনটি ভুব-জলের নীচে অনেক সময়েই সে দেখা যায় মৌন-ব্রতী। টু শব্দটি করতেও সে মনে হয় নারাজ। বস্তুবিবেকের কথা যা আগে উঠেছে, তা খুব প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে এই জায়গাটিতে। কারণ পাঠ্যে অন্তর্লীন তাই প্রায়শ দৃশ্যাতীত এই পঠনকে খুঁজে চিনে বৃদ্ধে বাজিয়ে নিতে হয়। এখানে যা খুব প্রয়োজনে আসে, যা ব্যতীত আমাদের একেবারে চলে না, তা ঐ বস্তুবিবেক—অর্থাৎ পাঠ্যক্রমের সংবেদনা, তার প্রবল ঘ্রাণশক্তি।

বশ্যতার পারস্পর্যকে মেনে তাকে আপ্রাণ টিকিয়ে রাখে বশব্দদ অনুলোম উত্তর-পাঠ্য, যেমন প্রাক্-পাঠ্যের ন্যায়কে সচেতন প্রয়াসে তছনছ করে, অন্তত কিছুটা তার বিরুদ্ধতায়, নিজেকে গড়ে তোলে প্রতিটি প্রতিলোম উত্তর-পাঠ্য। গ্রহণ ও বর্জনের যুগ্মি মেনে পোষক প্রাক্-পাঠ্য থেকে এভাবেই সব উত্তর-পাঠ্য জোগাড় করে নিজেদের পুষ্টি। তবে পুষ্টি যেমন তারা জোগাড় করে, তারা তা ফিরিয়েও দেয়। সমক্রমের তো বটেই, অনুক্রমেরও অক্ষ বরাবর, তার উভ-মুখী ঢাল বেয়ে, চালু থাকে নব নব তাৎপর্ষ্যের

আদান-প্রদান। এই অর্থে তারা দো-রোখা। তাই অতীতই যে শৃঙ্খল পুঁজি করে ভবিষ্যৎকে তা নয় ; রদবদল সহ, মতাদর্শগত পরিবর্তনের প্রতিটি বাঁকে, ঐতিহ্য ব'লে যা আমরা ছকে নিচ্ছি তার মারফৎ, বর্তমানও ফিরে গিয়ে উৎপাদন করে, অর্থাৎ নব নব আদল দেয়, অতীতকে।^{১০} অবশ্য উত্তর-পাঠ্যের চাইতেও আরো বেশি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা এক্ষেত্রে পালন করে বিশেষ বিশেষ ঐতিহাসিক পাঠন ; তাদের তাত্ত্বিক সক্রিয়তাই শিল্পীভূত, চলচ্ছিত্রহিত ঐতিহ্যকে ভাঙে-গড়ে, নব নব তাত্ত্বিক সীমা, আকার ও চরিত্র দেয় ; গড়ে ওঠে, রেমন্ড উইলিয়ামসের ভাষায়, নির্বাচিত ঐতিহ্য : নির্বাচিত শৃঙ্খল নয়, যা নির্বাচিতও। পাঠ্য-পরম্পরার কোন কোনটি ঐতিহ্যের অঙ্গীভূত, কেন, তা সে বারেরবারে পুনর্নির্বাচন করে ; যাকে আমরা সংস্কৃতি বলছি, গড়ে ওঠে তার ক্রম-পরিবর্তিত নানা আদল।

অনুলোম উত্তর-পাঠ্য প্রাক্-পাঠ্যের ন্যায়কে গভীরতা ও বিস্তার দেয় ; তার মধ্যে যেসব সম্ভাবনা অবিকশিত ছিল তারা সম্পূর্ণতা ও পরিণতি পায় উত্তর-পাঠ্যের দ্বারা। গভূলিকা-বৎ হয়তো নয়, কিন্তু সে অনু-গত, তাই প্রাক্-পাঠ্যের ন্যায়কে মাঝে মাঝে ছাপিয়ে উঠতে চাইলেও তার এই উন্মেষলতা একটি সাময়িক প্রবণতা মাত্র ; তাকে সে নিয়ন্ত্রণে আনে শেষ পর্যন্ত। অন্য দিকে, পোষক পাঠ্যের যুক্তিকে চিনে, কম বা বেশি, তাকে ভাঙতে পারাটাই হল কিন্তু, প্রতিলোম উত্তর-পাঠ্যের ক্ষেত্রে, নিজেকে গড়ে তোলবার একটি পূর্বশর্ত ; অন্তত অন্তর্লীন পাঠনের এই তাগিদই ভিতর থেকে তাকে সচেতনতা জোগায়। এর ফলে মতাদর্শগত বদ্ধতা প্রাক্-পাঠ্যের মধ্যে কোথায় কী ছিল, জটগুদলি খুলে কিভাবে তাকে নিরগল করে দেওয়া যেতে পারে—সে তৎপর হয় এসব সমস্যাকে ঘিরে।

পাঠ্য চক্ষুঃমান। নিজের মনোযোগকে সে সংহত করতে পেরেছে, ফলে আলোকপাত ঘটেছে কতকগুলি নির্বাচিত প্রশ্নের ওপর। তবে খুব বড় একটা দাম দিয়েই কিন্তু এই সংহতি অর্জন করা সম্ভব হয়েছে তার পক্ষে : মনোযোগের বাইরে, নির্বাক অশ্রুতার মধ্যে সে ঠেলে দিতে বাধ্য হয়েছে অপর কিছু প্রশ্নকে যেগুলি তার বিবেচনায় অন্তর্ঘাতি-মূলক। তারা অনুখাপিত রয়ে গিয়েছে। নিজের মধ্যে অবদমনের সূত্রটিকে এভাবে কার্যকর করেই কেবল পাঠ্য নিজেকে গড়ে তুলতে পারে, এখানেই তার তাত্ত্বিক বদ্ধতা।

সাহসী নতুন পৃথিবীর আশ্চর্য সব মানদণ্ডের কল্পনায় উদ্দীপিত হয় মিরান্ডা। অথচ তার চোখের সামনে, কিন্তু সম্পূর্ণরূপে তার মনোযোগের বাইরে, পড়ে থাকে ক্যালিড্যান। মিরান্ডার অর্থে না হলেও 'নতুন বিশ্ব'-এরই সন্তান সে। তথাপি, একলব্যের মতো, সে পরাভূত, তাই সার্বিক অবদমনের শিকার। টেম্পেস্ট নাটকটিকে তার প্রোক্ষিত থেকে সাজালে কী রূপ সে পেতে পারে, তার মন্থ থেকে যে ভাষা কেড়ে নেওয়া হয়েছে^{১১} কিভাবে তাকে তা ফিরিয়ে দেওয়া যেতে পারে—প্রাক্-পাঠ্য থেকে এসব প্রশ্ন বিতাড়িত। এই মতাদর্শগত সচেতনতা তাগিদ দিয়ে গড়ে তোলে প্রতিলোম

উত্তর-পাঠ্যকে। পাঠ্য-পারম্পর্য বলে যাকে অভিহিত করা হয়েছে, সমর্থন, বর্জন ও পুনর্গঠন সহ, এভাবেই তা চলতে থাকে।^{১২}

প্রতিটি পাঠ্যই যেহেতু উত্তর-পাঠ্য, এটা তাহলে দেখা গেল, তার মধ্যে, নীরব বা মূখর, অন্তর্লীন হয়ে থেকে যাচ্ছে পঠন এবং প্রাক্-পাঠ্যকে চিনিয়ে দিয়ে গড়ে তুলছে তার ওপর নির্ভরশীল উত্তর-পাঠ্যের ন্যায়। অন্য দিকে, এটা কিন্তু মাথায় আমাদের রাখতে হয় যে সাধারণভাবে তাকেই কেবল পঠন বলে চিহ্নিত করা হয়েছে যা কোনো উত্তর-পাঠ্যের অন্তর্গত নয়; সে বহিঃরংগ, উত্তর-পাঠ্যের বাইরে একটি স্বতন্ত্র অবস্থান ও অস্তিত্ব রয়েছে তার: সে নিছকই, কেবলই একটি পঠন। তাই নির্বাচিত একটি প্রাক্-পাঠ্যের সঙ্গে ব্যাপ্ত হতে পেরেই সে চরিতার্থ— এমনকি তখনো, যখন ঐ পাঠ্যটির সচেতন বিরুদ্ধতায় সে নিজেকে উচ্চারিত করে। উত্তর-পাঠ্যের ভিতরে, তার সঙ্গে অন্তর্লীন হয়ে সে সক্রিয় নয়; তার অবস্থানটি বাইরে, সাংস্কৃতিক মেরুদ্বকরণে প্রাক্-পাঠ্যের দিকটি ঘেঁষে; তার সঙ্গে ব্যাপ্ত হবার জন্য যথাসম্ভি নিজেকে উজ্জার করে দিতে পারলেই সে কৃতার্থ।

নবজাত পাঠ্যের মধ্যে লীন হয়ে যে পঠনটি রয়েছে, তার মুখটি ঘোরানো ভবিষ্যতের দিকে, কেননা আভ্যন্তরীণ ন্যায়টি জুগিয়ে উত্তর-পাঠ্যকে পুষ্ট করছে সে। কিন্তু সাধারণভাবে পঠন বলে যাকে অভিহিত করা হয়েছে, উত্তর-পাঠ্য থেকে দূরে তার বহিঃরংগ সাংস্কৃতিক অবস্থান, তার বর্তমান তাকে তাগিদ জোগালেও সে প্রেরিত হচ্ছে অতীতে, প্রাক্-পাঠ্যের দিকে। তাই সৃষ্টিশীলতার সম্ভাবনা কোনো আগ্রহ জাগায় না তার প্রাক্-পাঠ্যের প্রতি উৎসর্গীকৃত চৈতন্যে। নিজের সীমাবদ্ধতার দায় মেনে নির্বাচিত গান্ধীটুকুর মধ্যেই সে সক্রিয় থেকে যায়। সে কি সজাগ? পাঠ্য যখন যখন এবং যেখানে যেখানে, নিশ্চুপ, তার ইশারাগুলি কি সাড়া জাগাচ্ছে তার উৎকর্ষ বিবেকে? পাঠ্যের প্রায়ান্ধকার বা অন্ধকারকে যে সে ভেদ করবে, তার অন্তর্দৃষ্টি কি ক্রান্তিহীনভাবে এতটা অনুসন্ধিৎসু? তার ধ্যানের মধ্যে কি রূপ পাচ্ছে পাঠ্যের সামগ্রিক? তা যদি হয়, তবেই সে চরিতার্থ। বলা বাহুল্য, সামগ্রিকের এই নির্দিষ্ট ধ্যানটি যে এককভাবে বৈধ, এমন কোনো অহংকৃত দাবি সে রাখছে না কিন্তু। বস্তুত সে সন্দেহ-পিপাচ, তাই বিশ্বজনীনতা ওরফে বৈজ্ঞানিকতার প্রতি তার ঘোর অবিশ্বাস।

সৃষ্টিশীল যে সে নয়, তা দেখা গেল। কিন্তু সে বিনয়ী; ব্যাপ্ত, তাই নিরলস; বস্তুবিবেক এবং তন্নিষ্ঠা তার মধ্যে ক্রান্তিহীনভাবে সক্রিয়, তাই সে মূলত সং। সর্বোপরি, চূড়ান্ত পরিণতির মূহুর্তে, যখন সে চরিতার্থ, তাই নিজের অস্তিত্ব যখন তার ধ্যানের অঙ্গীভূত হয়েছে, সে আর দৃশ্যমান থাকে না— অন্তত থাকবে যে না, নিজের ওপর এই দাবি সে রাখে। তা সে রাখতে বাধ্য কারণ সে হয়ে উঠতে চায় সম্পূর্ণরূপে স্বচ্ছ এবং অনাবিল। তার মধ্যে যা দৃশ্যমান হয়ে উঠছে তা তার অনচ্ছ, স্ফীত অহং নয়, পাঠ্য স্বয়ং। তাই তার দিকে মনোযোগ দেবার সময়টিতে, তাকে নয়, বস্তুত তার নিরহংকার আত্মোৎসর্গের সূত্র ধরে, তাকে পেরিয়ে আমরা দেখি,

অন্তত দেখবার কথা, পাঠ্যকে । এভাবেই, তার মধ্যে কার্যকর অভিপ্রায়ের পরিণতির মূহুর্তে দৃশ্যত অন্তর্হিত হচ্ছে পঠন ; এবং তার তিরোধানের এলাকাটিতে, ঐ অন্তর্ধান-পটে, এসে উক্ত হচ্ছে দূর থেকে আবির্ভূত পাঠ্য, বিশেষ করে তার তাৎপর্য । সুতরাং যা উক্ত হল, তার দাবি শুদ্ধ এইটুকু, তা পাঠ্যের দূরগত অনুব্রণন মাত্র, নতুবা পঠন নিজে বোবা । বোবা, হ্যাঁ, তবে মনে রাখা প্রয়োজন, বধির সে নয় ।

বাচাল পঠনও অবশ্য আছে— বাচাল এই কারণেই যে তা বধির । পাঠ্য কী বলছে, তা সে শুনতে পায় না, সে আগ্রহও তার নেই । প্রথমেই কিন্তু স্বীকার করে নেওয়া ভালো যে, আত্ম-বিলোপনের প্রায়-মর্ষকামী ষোঁকটি সত্ত্বেও, এমন কোনো সং পঠন সত্যি নেই যা পুরোপুরি স্বচ্ছ ও নির্বাক, তাই নিজের অবস্থান থেকে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে ধুয়ে-মুছে অন্তর্হিত হতে যা পেরেছে । তার ঐতিহাসিকতা, তার মতাদর্শগত ষোঁক ও তাত্ত্বিক ভর তাকে ন্যূনাদিক আঁবিল ও অনচ্ছ— অথবা, অন্য প্রেক্ষিত থেকে দেখলে, বর্ণাঢ্য ও প্রোজ্জ্বল— করে তোলে । সুপরিণত হবার মূহুর্তে সে যে আর দৃশ্যমান থাকে না, তা যে থাকবার কথা নয় তার— এটা তার সাফল্যের চূড়ান্ত তাত্ত্বিক সীমা, তাই বাস্তবে সম্পূর্ণ প্রাপণীয় হয়তো নয় । তবে এই তাত্ত্বিক সীমাটিকেই আদর্শ হিসেবে মাথায় রেখে প্রতিটি তন্মিষ্ট পঠন ব্যাপ্ত করে নিজেকে ; আগেই যেমন বলা হয়েছে, নিজের ওপর এই তার চূড়ান্ত দাবি ।

এদের ঠিক বিপরীত মেরুতেই কিন্তু দাঁড়িয়ে রয়েছে সেইসব পঠন যাদের বধির তাই বাচাল বলে উল্লেখ করা হয়েছে । আত্ম-কেন্দ্রিকতা এদের কোনোটিকে বিশ্বস্ত হতে দেবে না পাঠ্যের প্রতি, এদের যে কোনোটির দ্বারা গ্রস্ত পাঠ্য ফলে নিজেই তার দৃশ্য-মানতা হারায় । এই অহংকৃত পঠন সোচ্চার ও সশব্দ, তাই তার কাছে এসে কান পাতলে, কী যুক্তি মেনে পাঠ্য কী বলছে তা শোনবার উপায় থাকছে না কোনো । পঠন থেকে গায়েব পাঠ্য এক্ষেত্রে অদৃশ্য ও নির্বাক ; এবং তাকে ও তার তাৎপর্যসমূহকে গ্রাস, অন্তত আড়াল, ক'রে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যাচ্ছে দখলদার বাচালটিকে । এ যতটা স-শব্দ ঠিক ততটাই কালা, তাই অজিজ্ঞাসু । এই ঔপনিবেশিক পঠনের বাস্তবতাকে মেনে যে আমাদের নিতে হয় তা এই সহজ কারণেই যে সাংস্কৃতিক আগ্রাসনে পটু এই পঠনটি বাচাল, তাই মনোযোগ দিই বা না দিই এর উচ্চ-গ্রাম ঢঙ্কা-নিলাদ শুনতে আমরা কার্যত বাধ্য । এসব পঠন যে বিদ্যমান তার যুক্তিকে তারা সংগ্রহ করে নেয় নিজেকে চিৎকৃত সাংস্কৃতিক উপস্থিতি থেকে ; তারা আছে, এটাই তাদের থাকবার একমাত্র যুক্তি ।

এতক্ষণ যে গোপ্তের পঠনের কথা বলা হল, প্রতিলোম উত্তর-পাঠ্যের সঙ্গে তাদের গাঢ়লিয়ে ফেললে বড় একটা ভুল হয়ে যাবে । প্রাক্-পাঠ্য থেকে দূরে নিজের স্বাতন্ত্র্য নিয়ে গড়ে ওঠে প্রতিলোম উত্তর-পাঠ্য । প্রাক্-পাঠ্যের নাম সে জপে না ; এই দাবিটিও সে রাখে না, অহংকৃত বাচালটি যা রাখতে বাধ্য, যে তার বাস্তবতার দ্বারা উক্ত হচ্ছে প্রাক্-পাঠ্য । প্রাক্-পাঠ্যের দ্বারা সে আশ্লিষ্ট নয়, তাতে লীন হবার ব্যাপারেও কোনো

মাথাব্যথা নেই তার। তার ঐতিহাসিক উত্থান-ভূমি যে স্বতন্ত্র, সে তা জানে, তবে এই স্বাভাব্য সত্ত্বেও সে উৎকর্ণ ; তাই স্বচ্ছতার অভাব থেকে নয়, প্রাক্-পাঠ্যের তাত্ত্বিক বদ্ধতা বিষয়ে সজাগ অন্তর্দৃষ্টি রয়ে গিয়েছে বলেই তার সচেতন বিরুদ্ধতায় নিজেকে গড়ে তোলবার প্রয়োজন সে অনুভব করে। এই যুক্তি মেনেই নিজেকে সে বিন্যস্ত করে, অর্থাৎ হয়ে ওঠে।

ঠিক এই স্বচ্ছতা এবং আদর্শবোধের অভাবেই কিন্তু অনচ্ছতার আড়াল দিয়ে প্রাক্-পাঠ্যকে ঘিরে অথচ মূখে তার নাম জপতে জপতে, মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে যাকে এখানে অভিহিত করা হল দখলদার ঔপনিবেশিক পঠন বলে। সে যে বিবশস্ত, সৎ, সে যে আদর্শনিষ্ঠ—এই নিলজ্জ দাবিতেই সে উচ্ছেদ করে পাঠ্যের দাবিকে, তারপর অবলীলায় দখল করে তাকে। এটা কেন ঘটে তা বোঝা কঠিন নয় : এক দিকে সক্রিয় তার ঔপনিবেশিক লালসা, তার আগ্রাসন ; অন্য দিকে, তাকে পণ্ডু করে রাখে তার তাত্ত্বিক আলস্য। এই নিষ্ক্রিয়তার বাবদে সে চলচ্ছিত্তিহীন তাই পাঠ্যকে তন্ন তন্ন করে অনুধাবন করে ব্যাপ্ত হবার জন্য উদ্যোগ নেবার ব্যাপারে না রয়েছে তার ক্ষমতা, না সেই সিদৃষ্টি। প'ড়ে, বা না-প'ড়ে, পাওয়া পাঠ্য তার উপনিবেশ মাত্র, যদিও এই বকধার্মিকটির পক্ষে মূখে তা স্বীকার করা সম্ভব নয়। তাত্ত্বিক নিষ্ক্রিয়তার সঙ্গে ঔপনিবেশিক আগ্রাসনের সমবায়ই সূত্রাং গড়ে তোলে দখলদার পঠনকে।

নিরলস, বিনয়ী, সৎ পঠন, তাহলে বোঝা গেল, স্বচ্ছতা অর্জন করবার ব্যাপারটিতে কেবল সচেতন : ঐ তার চরিতার্থতার তাত্ত্বিক সীমা। এই যে পাঠ্যের সঙ্গে ব্যাপ্ত হতে গিয়ে সে লীন হচ্ছে তার তাৎপর্য—অন্তত সে ব্যাপারে তার যে এই আন্তরিক মৃদুর্বা—তার সাংস্কৃতিক ফলাফলটি একটু লক্ষ করবার মতো। দেখা যাক কিভাবে তার এই বিনীত অ-মুখরতা বাচন-ক্ষেত্রটিকেই ঘনত্ব ও সংবদ্ধতা দেয়।

মেনে নিতে বাধা নেই যে পঠনের তরফে এই স্বেচ্ছা-প্রণোদিত আত্মোৎসর্গটি না ঘটলে, যত না কেন সমৃদ্ধ হোক তার তাৎপর্য, নিজের বাইরে নিজের সাংস্কৃতিক অনুপস্থিতির দ্বারা সীমাবদ্ধ থেকে যেত পাঠ্য। অন্য দিকে, দেশে, কালে ও লোকে, ভিন্ন ভিন্ন নিরহংকার কিন্তু মেধাবী পঠন যেমন যেমন তাদের দৃশ্যমানতা হারাচ্ছে, তার তার অবস্থানে আবির্ভূত হয়ে তেমন তেমন উক্ত হচ্ছে পাঠ্য ; এবং ঐ ঐ অবস্থান থেকে বিচ্ছুরিত হচ্ছে, ভিন্ন ভিন্ন নির্বাণোন্মুখ পঠনের ক্ষয়িষ্ণু বর্ণাঢ্যতার দ্বারা রঞ্জিত, তার তাৎপর্যের নানা-মাত্রিকতা : যা ছিল এক, সাংস্কৃতিক উপস্থিতির বিস্তারবশত তা হয়ে উঠছে বহু ; যা লৌকিক, তা হচ্ছে বিভূ। তাৎপর্যের উন্মুক্ত ব'লে আগেই যাকে অভিহিত করা হয়েছে এই যে তার উপচয়, বা বৃদ্ধি, ঘটল, তা পাঠ্যকে দিচ্ছে বিস্তৃতি ও গভীরতা, ফলত সাংস্কৃতিক ঘনত্ব। নব নব মেধাবী পঠনের সহায়তায় এই ঘনত্ব পাঠ্যকে আমরা দেব কি না, দিলে তা কোন্ পাঠ্যকে, কেন, এগুনি জরুরি প্রশ্ন। অনিশ্চয়তার ঝুঁকি নিয়ে হলেও, এ বিষয়ে দৃ-একটি ইঙ্গিত দেবার চেষ্টা করা যাক।

ধরা যাক সম্রাট বাধা দিলেন না ; রুন্ডিসিউসে আনীত কবির মৃত্যুকালীন ইচ্ছানুসারে ভঙ্গীভূত করা হল তাঁর মহাকাব্যটি । সেক্ষেত্রে বিশ্বসাহিত্য থেকে শব্দ যুগে ইনীড লব্ধ হত তা তো নয় ; তার উদ্ভব-মুহুর্তেই লব্ধ হত লাতিন স্বর্ণযুগের উজ্জ্বলতম রত্নটি ; এবং হারিয়ে যেত— বলা ভাল, অগঠিত থেকে যেত— সেই ব্যক্তি-প্রতীকটি, যার মধ্যে মূর্ত হয়েছিল আবহমানতার যুগ্ম মেনে পাশ্চাত্য সংস্কৃতির যৌগপদ্যের শৃঙ্খলাটি ।^{১২৩} কেননা, মধ্য যুগের সংস্কৃতি এবং ধর্মবিশ্বাসের প্রোক্ষিত থেকে দেখলে, কবি ভার্জিল ও তাঁর কাব্য ছিল সামগ্রিকভাবে সেই যোজক যার দ্বারা, দুর্দিক থেকে এসে, যুগ্ম হচ্ছে প্রতীচীর মানসলোকে যা যা খ্রীষ্টপূর্ব এবং যা যা খ্রীষ্টোত্তর । সস্ত পল না কি নেপলসে তাঁর সমাধিতে কবিশ্রেষ্ঠ বলে তাঁকে সম্বোধন করে অশ্রুপাত করেছিলেন । ভিত্তিহীন হলেও এই ঐতিহ্যটির মধ্যে দ্যোতিত হচ্ছে আত্মিক যৌগ-পদ্যের ঐ প্রতীকী তাৎপর্যটি । মহাকাব্যটি টিকে না থাকলে, আরো যা বড় কথা, বিন্যাসের অপর কোনো ন্যায়কে আশ্রয় ক’রে দান্তেকে রচনা করতে হত তাঁর মহাকাব্যটি । স্বর্ণস্বারে— তবে অবশ্য ঐ পর্যন্তই— শরণাগতকে যিনি আনয়ন করলেন, পৌত্তলিক হলেও তিনি নেতা । ঘটনা-বিবরণ তাই অলস জল্পনা হলেও প্রসঙ্গটি এই : এই আত্মিক নেতৃত্বের মহিমায় স্বদেশবাসী আর কোন্ পৌত্তলিক কবিকে বৃত্ত করা সম্ভব ছিল উত্তরসূরী খ্রীষ্টান মহাকাবির পক্ষে ? নিশ্চয় ওভিড বা কাটুল্লুসকে নয়, এমনকি হয়তো হোরেসকেও নয় ।

টেনিসনের ভার্জিল-প্রীতিকে খুব সংগত কারণেই আমরা সন্দেহের চোখে দেখি। তবে তাঁর ঐ বাস্তবিকই অক্ষম অনুকারকের মতো ভার্জিলও কি নিছকই স্বেদান্ত রীতি-সর্বস্বতার কবি ? শব্দগান তিনি গাইছেন, মানুষেরও কি নয় ? কেবলই কীর্তি ও বিজয়ীয়ার কবি তিনি, বিহত প্রেমেরও কি নয় ? সাম্রাজ্য বিস্তারের কবি বলে কি তাঁকে বাতিল করা সম্ভব ছিল, অন্তত মধ্যযুগ ও রেনেসাঁসের পক্ষে ? সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও, আন্তরিক নিসর্গ প্রেমেরও কবি তিনি, ফলত প্যাস্টোরালের । ভুল, ভিত্তিহীন পঠন ঠিকই, কিন্তু চতুর্থ একলগের ধর্মীয় অনুষণকে কে অস্বীকার করবে ? প্রথম চাল’স থেকে রাবলের প্যানার্জ পর্যন্ত, স্মরণ করুন সোটি’জ ভার্জিলিয়ানিকে ঘিরে গড়ে ওঠা ঐতিহ্যগুলির বিস্ময়কর বিস্তার ও বৈচিত্র্য । মধ্যযুগের খ্রীষ্টীয় ধর্মবিশ্বাসে মনঃদ্রষ্টা ও জাদুকর হিসেবে যে সাংস্কৃতিক উপস্থিতি তিনি অর্জন করেছিলেন, ভিন্ন ভিন্ন উত্তর-পাঠ্য ও পঠন যে ঘনত্ব দিয়েছিল ঐ উপস্থিতিতে, ইনীডের অবলম্বিত বা তা যদি অজ্ঞাত কোনো কারণে উপেক্ষিত হয়ে পড়ে থাকত পাঠ্য-সংসারের কিনারায়, তা তো অগঠিত থেকে যেত । উদাহরণ স্বরূপ, পাঠ্য-পারম্পর্যে আমাদের দিকটি ঘেঁষে, সেক্ষেত্রে অলিখিত থেকে যেত বর্তমান শতাব্দীর একটি শ্রেষ্ঠ উপন্যাস : ভার্জিলের প্রয়াণ ।

আরো কী হারাত— বা অগঠিত থেকে যেত— পাণ্ডিত্যের অভাবে সে বিষয়ে বিশদ কোনো কিছু বলা আমার পক্ষে সম্ভব নয় । তাও যে উদাহরণটি দিলাম তা শব্দ সংক্ষেপে

এই বস্তুটি স্পষ্ট করবার জন্য যে তার কাব্যের মতাদর্শগত মূল্য যা-ই হোক না কেন, সমান লয়ে না হলেও, দৃ-হাজার বছর ব্যোপে অনেকটা এদেশে রামায়ণের মতো, প্রতীচ্য সংস্কৃতির ক্ষেত্রটিতে ঈনীদের উপস্থিতির ঘনত্বে অস্বীকার করার কোনোই জো নেই। আরো যা বড় কথা, নিজ তাৎপর্য-পরিধির মধ্যে কাব্যটি নিছক নিজে যা, উপস্থিতির কেন্দ্রস্থতাবশত তার সাংস্কৃতিক প্রক্ষেপ তাকে ছাপিয়ে গিয়েছিল বহুগুণে। সুতরাং বস্তু দাঁড়াল এই যে পাঠ্য অনেক, তারা তর-তম; পাঠক্রিয়ার তাগিদে তাদের উপস্থিতির তার-তম্য শেষ পর্যন্ত কী দাঁড়ায় সেটা কিন্তু একেবারেই আলাদা বিচার। ভার্জিল পঠিত হন, টাসিটস উপেক্ষিত থেকে যান; দৃশ্যপট জুড়ে ছায়া ফেলে একজনের সাংস্কৃতিক উপস্থিতি, মনোযোগের কেন্দ্রে আসবার জন্য দ্বিতীয় জনকে অপেক্ষা করতে হয় প্রায় দেড় হাজার বছর।

ঘুরিয়ে তাই হয়তো এভাবেও বলা চলে যে অনীহাবশত আড়ে বসে থাকলে চলে না পাঠের, ঐ বৈরাগ্য অন্তত তাকে মানায় না।^{১৪} পাঠক্রিয়ার আশ্রয়কে আন্তরিকভাবে কামনা করতে সে ন্যায়ত বাধ্য— ভুল তাৎপর্য তার ওপর আরোপিত হবে, এমনকি এই ঝুঁকি মাথায় নিয়েও। ইতিহাসের রোদজল থেকে গা বাঁচাতে চাইলে, তা যদি সে সত্যি চাইত, বিবিস্ত থেকে যেত পাঠ্য। বিভিন্ন পঠনের সহায়তায় উপচে উঠে যা গ'ড়ে তোলে তাৎপর্যের উদ্ভবকে, তা উপচিত হত না; পাঠের চার দেয়ালের মধ্যে, শূন্যস্থে, শিলীভূত থেকে যেত তাৎপর্য। সেক্ষেত্রে নিজের মধ্যে অন্তরীন হয়ে পড়ে রহিত পাঠ্য নিজেও; গুরুত্বের তার-তম্য অনুসারে তার মধ্যে বীজাকারে থেকে গিয়েছিল সাংস্কৃতিক ঘনত্বের যে সম্ভাবনা, ইতিহাস থেকে দূরে, বিমনোযোগে, তা আর বাস্তবায়িত হত না।

সুখের কথা, পাঠ্য উদাসীন নয়, কেননা তার বিবক্ষাই তাকে গড়ে তুলেছে। তাও যদি আড়ে বসে থাকতে দেখা যায় তাকে, তার অর্থ হল এটাই যে সে নয়, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য নিজে তার প্রতি উদাসীন। তবে নানা ঐতিহাসিক তাগিদে সাংস্কৃতিক মনোযোগের ভরটি স'রে স'রে যায়, তখন বিকেন্দ্রিত পাঠ্যকেও নিজের গোচরে আনতে বাধ্য হয়^{১৫} সে : এমনকি মার্গ পাঠের ধারণাটি পাল্টায়, ফলে এতকাল যা উপেক্ষিত ছিল— যেমন ধরা যাক লালন ফকিরের পদাবলী— তা অঙ্গীভূত হয় মার্গ সাহিত্যে; যাকে মনে করা হত সংসার-ছুট, উদাসীন, পাঠক্রিয়া তাকে টেনে আনে ইতিহাসের রোদেজলে। তারপর কেন্দ্রীয় যদি সে হয়ে ওঠে— প্রথমাবধি কেন্দ্রীয় থেকে গেলে তো কোনো কথাই নেই— উত্তর-পাঠ্য এবং পঠনের পরম্পরাকে বেয়ে, ভিন্ন ভিন্ন বিরুদ্ধ মতাদর্শের ঘাত-প্রতিঘাতে, সকল তির্যগতা সহ, সে ধরা দেয় ভিন্ন ভিন্ন পঠনে; তাৎপর্যের নব নব উপলেপে ক্রমে স্ফীত হয় সে।

এই ঐতিহাসিক বিক্রিয়ার জের যখন পাঠের ওপর এসে পড়েনি, ঠিক কী ছিল তার অনাহত, আদিম তাৎপর্যটি— বাইরে নয়, উদ্ভব-মুহুর্তে, একমাত্র নিজের অবরোধের মধ্যেই যখন হাজির ছিল বিশুদ্ধ পাঠ্য— তা বড় জোর একটি তুমুল কিন্তু নিষ্ফল বিতর্কের বিষয় হতে পারে। কারণ পঠন-জানিত স্ফীতিকে ডিঙিয়ে, পাঠের ওপর

যাবতীয় ঐতিহাসিক বিক্রিয়ার জেরকে সর্বাংশে নাকচ করে, বাইরে থেকে উপচে পড়া বহিঃপাঠ্যের জেরকে সম্পূর্ণরূপে ধুয়ে মূছে, একটি নেতৃস্থানীয় পঠনের সহায়তায় এবং কেবল তারই মধ্যে পাঠ্যের সর্বকালীন বিশুদ্ধ সারাংশকে উদ্ভুল করা সম্ভব বলে মনে হয় না। কেন, তা একটু ভেবে দেখা যাক।

এক হিসেবে প্রচেষ্টাটি নিজেই কিন্তু নিজের ব্যর্থতার একটি বড় নিদর্শন। তাৎপর্যের একমাত্র বিশ্বস্ত, তাই বৈধ, পঠন সে— এই দাবি নিয়ে নবজাত পঠনটি বাজারে এসে পৌঁছয়, হয়তো তাৎক্ষণিক একটি সাড়াও সে ফেলে। তবে টের পেতে দেরি হয় না যে সে আসলে পঠন-পরম্পরার সাম্প্রতিকতম প্রতিনিধি, তাই বড় জোর অনেকের মধ্যে আরেকটি : খুব বেশি হলে, প্রিমাংস ইন্টার পারেস, সমকক্ষদের মধ্যে প্রথম ও প্রধান। ইতিমধ্যে, সে যেহেতু অহংকৃত, বিম্বজনীনতার দাবিটি সক্রিয় থেকে যায় তার চৈতন্যে। ইতিহাস যে পিচ্ছিল ; তার নানা-রোখ তাগিদ যে, বিবিধ বিরোধী প্রোক্ষিত থেকে, বিবিধ আভ্যন্তরীণ ত্বির্গতা সহ, পাঠ্যক্রিয়াকে বারে বারে প্রেরিত করে পাঠ্যের দিকে ; এবং, সর্বোপরি, পাঠ্য নিজেও যে সাম্ভ্র, সরম্প্র, ভেদ-চিহ্নিত, তাই নিজের সঙ্গে পুরোপুরি অম্বিত বা সম-বিস্তৃত, নয় ; তা যে ক্রমাবিস্কৃত, ফলে নিজেকে তা যে ক্রমেই ছাপিয়ে উঠছে— এসব সে খেয়ালেই রাখে না। এই তাত্ত্বিক অশিক্ষা সত্ত্বেও, খুঁটির জোর থাকলে, কমবেশি, কালোমি স্বার্থের মদতে সে স্থগিতাদেশ জারি করে অন্যান্য পঠনের ওপর এবং, যেমন আগেই বলা হয়েছে, কেড়ে নেবার চেষ্টা করে তাদের বৈধতা। ফ্রেজার, এবং পরে এলিয়ট কথিত ‘পুত অরণ্য’-এর পুজারির মতো শেষ পর্যন্ত তা সে পারে না বটে, কিন্তু ততদিন যতটুকু যা জ্বলন্ত খাটানো সম্ভব, তা সে খাটায়।

পাঠ্যকে একটি নিচ্ছিন্ন, নিশ্চেষ্ট গোটা একক হিসেবে দেখবার এবং দেখাবার চেষ্টা হয়েছে বারেবারে। বলা হয়েছে, সে আত্ম-দীর্ণ নয়, তাই নিষিদ্ধ এবং নিষিদ্ধ। পাঠ্য প্রবণত নয়, তাকে বড়বে নেবার সব সূত্রাবলী সে সাজিয়ে বসে রয়েছে ; সংগঠক যুক্তিকে বেছে তাকে তাই বোঝা সহজ। তার অকপটতা সম্পর্কে এই বিশ্বাস থেকে, যা নিজে ততটা অকপট হয়তো নয়, উপক্রম, উপসংহার, অভ্যাস, অপূর্বতা, ফল ইত্যাদি সাতটি লিঙ্গ বা চিহ্ন দিয়ে নির্বাচন ক’রে স্থান্য পাঠ্যের মধ্যে জন্ম তার তাৎপর্য নির্ণয়ের চেষ্টা করেছেন মীমাংসকেরা। মজার কথা, তাঁরাও কিন্তু লক্ষ করেছেন যে পাঠ্যের মধ্যে কিছুটা যেন তাৎপর্যের উদ্ভূত ধরা দিচ্ছে, আভ্যন্তরীণ হয়েছে যা পাঠ্যের অঙ্গীভূত নয়, কেননা তা তার মূল যুক্তির সঙ্গে অসংগত। মীমাংসকদের মতে, তা যেন অনেকটা পাঠ্যের মধ্যে গা-ঢাকা দিয়ে ঢুকে পড়া বহিঃপাঠ্যের জের। একে তারা অর্থবাদ বলে চিহ্নিত করেছেন এবং পাঠ্যের তাৎপর্য থেকে উৎখাত করে পত্রপাঠ বিদায় দেবার বিধান দিয়েছেন।^{১৬}

কিন্তু তাও একটি মূর্শকিল থেকে যাচ্ছে না কি ? কোন্টি অর্থবাদ, তার নির্ণায়ক কে ? তাকে চিনিয়ে দেবার যুক্তি পাঠক নিজেই যে বাইরে থেকে পাঠ্যের মধ্যে পাচার করছেন না, সেই নিশ্চয়তা কোথায় ? এটা ঠিক যে কোনো কোনো পাঠ্য তাকে চিনিয়ে

দেয় ; বস্তুত অভ্যাস, অপূর্বতা, ফল ইত্যাদি লিঙ্গের সেটাই হল কাজ। কিন্তু সব পাঠ্য তো বলে দেয় না, এটা এটা তার অন্তর্বস্তু, ওটা ওটা বহিঃপাঠ্যের আগন্তুক জের। সেক্ষেত্রে, এরকম সন্দেহ করা কি অবধা হবে যে পাঠ্যের আত্মদীর্ণতার সূচক উপাদান-গুলিকে বাতিল করা হচ্ছে সেই যুক্তি দিয়ে যা, নিজের অজ্ঞাতসারে হলেও, বাইরে থেকে পাঠ্যের মধ্যে আমদানি করছেন পাঠক স্বয়ং? অর্থবাদ ব'লে একবার যখন এভাবে তাদের পাঠ্য থেকে উপড়ে বাইরে ফেলে দেওয়া সম্ভব হল, কতিংগ পাঠ্য তখন হয়ে উঠল নিষ্পন্দ ও নিরাপদ। ফলে পাঠক এবার তাহলে নিতান্ত অকপটভাবেই এই দাবিটি রাখতে পারছেন যে পাঠ্যের মধ্যে কোনো ম্বিধা বা ফাটল নেই; এবং তাঁর নিজের পঠনে ধরা পড়েছে যে তাৎপর্যটি, তর্কাতীতভাবে তা-ই হল পাঠ্যের শাস্বত নির্যাস!

পঠন সূত্রাং দেখা যাচ্ছে চতুর— অতত যতক্ষণ পর্যন্ত তার সংগঠক যুক্তি অসমস্যায়িত, অর্থাৎ নিজের অ-গোচর, ফলে নিজের বোধের অনায়ত্ত, থেকে যাচ্ছে। আর ততক্ষণ পর্যন্ত বিজিগীষা নিশ্চিতভাবেই তাকে দেখা যায় ঠেলে দিচ্ছে সাফল্যের পর সাফল্যে। তা মনে হয় সে দেবেই দেবে!

সমস্যাটিকে নিকটবর্তী তবে ভিন্ন একটি প্রেক্ষিত থেকেও দেখা যেতে পারে। কোনো পাঠ্যক্রমই একেবারে তাজা ও আনকোরা, তাই তাত্ত্বিক অর্থে গো-বেচারার, অর্থাৎ অকপট, নয়; প্রত্যেকেই নিজ নিজ সাংস্কৃতিক অতীতে প্রোথিত, তাই অভিজ্ঞ। তার তার অভিজ্ঞতা এবং অভিজ্ঞতা-লব্ধ শিক্ষা গড়ে তুলছে পাঠ্য বিষয়ে তার তার সংস্কার। নিজের অভিমুখ যখন তাকে পাঠ্যের দিকে ঠেলেছে, বিশেষ পাঠ্যক্রমটির মধ্যে তার আগে থেকেই কার্যকর থেকে যাচ্ছে পাঠ্য কী বা কী নয়, কী সে বলতে পারে বা কী তার বলা উচিত, সে বিষয়ে ঐ সংস্কার-জাত অগ্রিম কোনো না কোনো প্রত্যাশা। পাঠ্য যেমন সংরচিত, পাঠ্যক্রমও তা-ই। ব্যক্তি-ইতিহাসের সূত্র ধরে খুব পিছিয়ে গেলেও এমন কোনো না-বালক পাঠ্যক্রমের খোঁজ মিলবে না যা পাঠ্যক্রম হলেও এতটাই আদিম যে, অনভিজ্ঞ, তাই অভিজ্ঞতা-লব্ধ সংস্কার থেকে সর্বাংশে মুক্ত। অন্য দিকে, কোনো পরিণত পাঠ্যক্রমের পক্ষে আবার নিজের চৈতন্যের তল থেকে আশ্রয়ী সংস্কারটিকে পদুপদুরি উন্মূল করা সম্ভব নয়, কেননা সেক্ষেত্রে তার সংগঠনের কাঠামোটাই তো— বানচাল যদি না-ও হয়— নড়বড়ে হয়ে পড়বে। আর কদাচিত্ উন্মূল করা যদি সম্ভবও হয়, সংস্কারের পদুরনো পরিকাঠামোটো যেমন বিজিত হল, তল থেকে তেমন দেখা যাবে জেগে উঠছে তার নবীনতর একটি রূপ। তখন নবোদ্ভূত সংস্কারের নবীনতর ন্যায়টিকে আবার নতুন করে বুনবে নেবার প্রয়োজন দেখা দেবে। নতুবা পাঠ্যটিগণিতের সেই হতভাগ্য বর্দিরের মতো তা পদুর্বার পা পিছলে পড়ে যাবে অসমস্যায়িত সংস্কারের থাকে। পৌনঃপুনিকতার প্রক্রিয়াটিকে মেনে বারেবারে সমস্যায়িত হয়ে ওঠার চেষ্টা তাই চালিয়ে যেতে হয় তাকে।

কিন্তু প্রক্রিয়াটি টিকিয়ে রাখা কঠিন। এর ফলে, যত না কেন তর্কিত সে হোক,

কিছুটা তিৰ্গতা বা অনিৰপেক্ষতা তার পঠনে আসতে বাধ্য। যখন সে পড়ছে, একটা নিৰ্বাচনের যুক্তি কাজ করছে তার মাথায়। কোন যুক্তি মেনে পাঠ্যের উপাদান-গুণিলিকে সে বেছে নেবে, কতটা কী আপেক্ষিক গুরুত্ব তাদের দেওয়া তার উচিত হবে এবং, সর্বোপরি, বিন্যাসের কোন ন্যায় মেনে তাদের সে সাজিয়ে নেবে— পাঠ্যক্রিয়াকে এসব বলে দেবে কে? তা নিশ্চয় তাঁর তাত্ত্বিক প্রস্তুতি, যা অনেকাংশে তার অভিজ্ঞতা-লব্ধ। কিন্তু ঐ প্রস্তুতির মধ্যেই তো, সর্বের মধ্যে ভূতের মতো, থেকে গিয়েছে অনিৰপেক্ষতা, অর্থাৎ সায়-অথবা আপত্তি-সূচক মূল্যায়নের নিয়ামক তিৰ্গতা। এটাই যেহেতু তার সংস্কার, সেইসব উপাদানগুণিলিকেই তো তাৎপর্যমণ্ডিত বলে বেছে নেবার ষোঁকটি কাজ করে পাঠ্যক্রিয়ার মধ্যে যা আগে থেকেই তার প্রত্যাশা এবং সংস্কারের সঙ্গে সংগতি-পূর্ণ; এবং চক্রবৎ, ১৭ তারাই আবার ফিরে গিয়ে পদাঙ্কিত জোগায় তার সংস্কারকে : ক্রমে তা আরো দৃঢ়মূল হয়ে ওঠে। ১৮ পারিস্থিতিটা অনেকটা এরকম দাঁড়াল যে ভোট দেবার অধিকার দেওয়া হল একমাত্র তাদেরই, শাসক দলের সমর্থনে যারা আগে থেকেই হাত তুলে বসে আছে।

পাঠ্যক্রিয়ার এই রকমফেরটিকে কি খুব পরিচিত ঠেকছে? যদি হয় তো তা খুব সহজ কারণে। সাংস্কৃতিক এবং রাজনৈতিক উপস্থিতির ব্যাপ্তবশত মার্ক্সবাদী পঠনের যে ধারাগুণি আমাদের বেশি পরিচিত, লক্ষ করলে দেখা যাবে, সমস্ত অনুশীলন বা উৎকর্ষ বিবেক নয়— অনেক সময়ে তা একেবারেই নয়— তাদের যতটা সক্রিয় করে নিজেদের অদ্রাস্ততা সম্পর্কে স্বতঃসিদ্ধ জেদ, চূড়ান্ত পরাভবের মনুহুতেও এই অবিসংবাদী এবং নিশ্চিত আত্মপ্রসাদ যে জিতে তারা বসেই আছে। মেডুসার দিকে তাকালে অশ্মীভূত হত ডাইনিটিকে যে দেখল, মার্ক্সবাদী পাঠ্যক্রিয়ার বিজিগীষু প্রজ্ঞা যে সমস্যাটির ওপর তার তন্দ্রালস নজর ফেলে— পূর্ব ইউরোপ, চীন, কম্পাউচিয়া— পরমমুহূর্তে তা দুরীকৃত, অর্থাৎ ন-স্যাৎ, হয়। এই তা-হলে তার বিজিগীষা-প্রসূত আত্মলাঘা। বলা হয়েছিল বিজিগীষা চতুর। তবে কি তা অবিম্ভ্যাকারী, তাই নৈরাশ্যের কালবেলাতেও এতটা আত্ম-সন্তুষ্টি?

এটাই তাহলে পাঠ্যক্রিয়ার বিজিগীষা— তার উইল টু পাওয়ার। ক্ষেত্রবিশেষে অবিম্ভ্যাকারী হলেও মূলত সে চতুর। লা রশফুকোর অনুকরণে একথা কি বলা যায় যে তার আমদুর প্রপূর বা আত্মরতি তাকে চতুর করে তুলেছে? নিজেকে সে এতটাই ভক্তিপ্রদা করে যে, জ্ঞাতসারে না হলেও, সতর্ক চাতুর্ষের সঙ্গে সদাই নিজেকে জিতিয়ে দিতে সে বদ্ধপরিবৃত। তাই নিজের ন্যায়কে সে আগে থেকেই এমনভাবে সাজিয়ে রেখেছে যে, যত না কেন সে অজিঞ্জাসদু হোক— জিজ্ঞাসার অভাব তাত্ত্বিক গোঁ-কে তো আবার দৃঃসাহসও জোগায়! —এটা নিশ্চিত যে সাফল্য সে অর্জন করবেই করবে। কোনো পাঠ্যই তার কাছে সমস্যায়িত নয়, কেননা পাঠ্যের সঙ্গে ব্যাপ্ত হবার আগেই, ঐ চাতুর্ষের সতর্ক তত্ত্বাবধানে, সমস্যাটিকে সে তো পাঠ্য থেকে উৎপাটিত করে বসেই আছে। নিঃসন্দেহে প্রবণতাটি বিশেষ করে সক্রিয় থাকছে যতক্ষণ পর্যন্ত না পাঠ্যক্রিয়া

নিজের কাছে সমস্যাযিত হয়ে উঠছে, ফলে নিজের সংগঠনের ন্যায়টিকে সে চিনে ও বুঝে না নিচ্ছে।

আমাদের অবস্থান তাহলে এরকম দাঁড়াল যে পাঠক্রিয়া মাত্রই না কি অনপন্যেয় আপেক্ষিকতা দোষে দুষ্ট, তার হাত থেকে নিস্তার নেই। এটাই যদি তার অবধারিত পরিণাম হয়, সেক্ষেত্রে এই আপত্তিটা উঠতে বাধ্য যে তার বস্তুবিবেক সক্রিয় কি না বা কত দূর পর্যন্ত তা তন্মিষ্ট, শেষ বিচারে এসব প্রশ্ন অবান্তর। ফেল করাটাই যদি সবার অনিবার্ণ ভবিষ্য হয়, অথবা খেটে কে আর পরীক্ষায় বসবে? তাছাড়া, সত্যিই তো, পাশ-ফেল কার কী করা উচিত, সে ব্যাপারে যে বিচারকটি রায় দেবেন তিনিই বা কী এমন স্থিতপ্রজ্ঞ? তিনি যে সমদর্শী অথবা যে নিরীক বা তৌলে মাপজোখ হচ্ছে তা যে অপেক্ষাপাতী, অর্থাৎ নিরপেক্ষ, তারই বা নিশ্চয়তা কতটা?

কিন্তু এভাবে আপত্তিটা উঠলে অসুবিধা এই দাঁড়ায় যে পাঠক্রিয়ার আপেক্ষিকতা নিজেই যে আপেক্ষিক, সেই জরুরি সত্যটা দেখা যায় আমরা ভুলে বসেছি; এর ফলে একটি তাত্ত্বিক বিভ্রান্তি তৈরি হয় তার চরিত্র বিষয়ে। আপেক্ষিকতা বলতে পাঠক্রিয়ার তিৰ্ণগতাকে যদি নির্দেশ করা হয়, তা কোনো পরম বা ধ্রুবকল্প নয়। তার স্ফারা দুষ্ট হবার অর্থ এরকম আদৌ নয়—বিভ্রান্তিটি এই জাগ্রগায়—যে সব পঠনই সমান আপেক্ষিক কেননা তারা পাঠ্য-তাৎপর্যের কেন্দ্র থেকে সমান ব্যবধানে, তাই যেন তাকে ঘিরে একটি সূ-দূর পরিধি বরাবর, অবস্থিত, তাই তার দূরত্ব, লব্ধিকায়িত সত্য থেকে সম-পরিমাণে বিচ্যুত! যেন ঐ পরিধি বরাবর পঠন-পরম্পরার মধ্যে চলছে সমানই অফলপ্রসূ উত্তোরচাপান; আর তাদের সবার নাগালের বাইরে, পাঠ্য-তন্মাত্রের কেন্দ্রে, পড়ে রয়েছে, তার কুটস্থ, অনুশ্ৰুতিত তাৎপর্যটি—কোলাহল থেকে দূরে যা তার অনাহত তাৎপর্য-তন্মাত্র।

প্রথমেই বলে নেওয়া দরকার যে, নিবোধি বা ধৃত, অব্যাপৃত পাঠক্রিয়া আছে—আপেক্ষিকতার দোহাই দিয়ে তাদের বৈধতা দেওয়া যাচ্ছে না কিন্তু। তারা পাঠক্রিয়া নয় কারণ তারা পাঠ্যের সঙ্গে আদৌ ব্যাপৃত হচ্ছে না, তাই তাকে তারা পড়ছে না। আবার এটাও ঠিক যে সংখ্যায় এরা নগণ্য নয়। এদের নিয়ে নয়, কেবল তন্মিষ্ট এবং ব্যাপৃত পাঠক্রিয়ার চরিত্র নিয়েই, সংখ্যা তাদের যাই হোক, আপেক্ষিকতার প্রশ্নটি প্রাসঙ্গিকতা পাচ্ছে। বুঝে ওঠার চেষ্টা করা যাক কী অর্থে তাদের মধ্যে আপেক্ষিকতা অর্থাৎ কিছুরটা যেন অনিশ্চিত থেকে যেতে বাধ্য এবং কী অর্থে এই আপেক্ষিকতা নিজেই আপেক্ষিক; তাই—এটাও বুঝতে হবে—ব্যাপৃত হবার এবং নিরলসভাবে তা থেকে যাবার দায়িত্বকে নাকচ কিছুরতেই করা যাচ্ছে না।

সূটিকর্ম, অর্থাৎ পাঠ্য-তন্মাত্র, থেকে পাঠ্য যেমন যেমন সরে এল পাঠকের দিকে—আমরা দেখেছি, বাতের মতে পাঠ্য হয়ে উঠবার প্রাক-শর্তই হল তা-ই—বিকেন্দ্রিত হল তাৎপর্য; দেখা গেল, সেও সরে এসে সংলগ্ন হয়েছে যাকে ব্যাপৃতির উভমুখ বলা

হয়েছে তার সঙ্গে। ফলে কুটস্থ নয় আর, সে এখন বরং পাঠক্রিয়া-সাপেক্ষ হয়ে উঠেছে। এরপর ভিন্ন ভিন্ন পঠনে ধরা দেবার প্রক্রিয়ায় তার যে নূন্যাদিক মতাদর্শগত প্রতিসরণ ঘটছে, তা কতটুকু এবং কেন, আপেক্ষিকতার প্রশ্নটি গুরুত্ব অর্জন করেছে এই জায়গায় এসে।

ধরা যাক, পঠন-উত্তীর্ণ তাৎপর্যের অনাহত ও অবিকল রূপ একটি আছে। তবে পাঠক্রিয়ার বিক্রিয়ার জের এসে পড়বার আগে তাৎপর্য নিজের মধ্যে নিজে যা, আমরা জানি, তার এই তন্মাত্রকে কোনো মতেই উদ্ধার করা সম্ভব নয়; তবে পাঠ্যে নির্দিষ্ট পাঠক্রিয়া অতটা ভেবে ওঠবার সময় পায়নি এখনো। তাই তাৎপর্যকে যে পাঠ্যের অন্তর থেকে টেনে এনে পঠনের সদরে উত্তোলিত করা সম্ভব, এই জেদই আভ্যন্তরীণ জড়িয়ে পাঠক্রিয়াকে ব্যাপ্ত করছে পাঠ্যের সঙ্গে—এটাই হল তার মধ্যে সক্রিয় নৈতিকতার তাগিদ। পাঠ্য এবং তার তাৎপর্য বিষয়ে সে যে সজাগ ও পরিশ্রমী, তার কারণ তাহলে তার এই স্বাস্থ্যকর কুসংস্কার।

উপরন্তু এটাও ঠিক যে পাঠ্য কোনো অতিবস্তু, অর্থাৎ অতীন্দ্রিয় পরাবস্তু, নয়। সুতরাং এই মরমিয়া দাবিটি মেনে নেওয়া গেল না, অজ্ঞাবাদ তার যুক্তি সংগ্রহ করে যে অপরিষ্কৃত সংস্কার থেকে, যে বাঙমনের সে অগোচর। পাঠ্যের মধ্যে হয়তো ম্ভিজান রয়েছে, অর্থম্বেধ রয়েছে, সে আত্ম-দীর্ণ, তাই দুরূহ—এসবই ঠিক। কিন্তু সে অবিতর্ক বা বোধাতীত নয়। কোন্ কোন্‌টি বস্তু, কোন্ কোন্‌টি অবস্তু, পাঠ্যের প্রায়ান্ধকারে কোন্ কোন্ অনুপস্থিত উপস্থিত, কোন্ কোন্‌টি নয়—বিশেষজ্ঞানসাধক এই বিচারশীলতা বা বিবেককেই বস্তুবিবেক বলা হচ্ছে। পাঠ্যের বস্তুসত্তা আছে, সে একটি ‘তৎ’। এই কারণেই পাঠক্রিয়াকে তৎ-নিষ্ঠ হতে হয়; এখানেই কার্যকর হয় তার তদাত্ম্য, তার বস্তুবিবেক।

কিন্তু বস্তু থেকে বিশ্লিষ্ট বিশুদ্ধ বুদ্ধির সঙ্গে এই বিচারশীলতাকে গুলিয়ে ফেললে বা এক করে দেখলে চলবে না; অন্যদিকে, মাপজোখের যেসব পদ্ধতিগত বৈশিষ্ট্য প্রকৃতি বিজ্ঞানকে তার নিজস্ব চরিত্র দিয়েছে, এখানে তাদের কোনোই প্রযোজ্যতা নেই। পাঠ্যে প্রযুক্ত এই বিচারশীলতাকে কি পাঠ্যবোধ বলব? না কি তা সহৃদয় তাৎপর্য-গ্রাহিতা, উৎকর্ষ অন্তর্দৃষ্টি, পাঠক্রিয়ার সজাগ ঘ্রাণশক্তি? যদি ধরে নিই এসবের সমবায় গড়ে উঠেছে পাঠ্যবিবেক, তার সঙ্গে যুক্ত করতে হবে, এক দিকে, সামগ্রিকের ধ্যান এবং, অন্য দিকে, আপাত দৃষ্টিতে যা খুবই মামূলি সেই কাণ্ডজ্ঞান। সমালোচককে তথ্যনিপুণ হতে হবে, এলিয়টের এই দাবি যদি সমালোচকের নৈপুণ্যের উদ্দেশ্যসীমা হত, তাতে মিস্টার গ্র্যাডগ্রাইন্ড খুব খুশি হতেন। তবে কবি-সমালোচক নিজে তা হতেন কি? তথ্যনিপুণ্য তাঁর পারদর্শিতার অধঃসীমা মাত্র।

উৎকর্ষ অন্তর্দৃষ্টি এবং তথ্যনিষ্ঠা যতটা যা তার থাকুক না কেন, পাঠক্রিয়ার মধ্যে আপেক্ষিকতার যাকে বলা চলে আপেক্ষিক একটি জের এসে পড়ে, যেমন আগেই নির্দেশ করা হয়েছে, এর কারণ হল তার উদ্ভবের ঐতিহাসিকতা। মতাদর্শগত

তাগিদের তিৰ্গতা বা তাত্ত্বিক সংস্কার, যে নামেই একে ডাকি, এ হল তার বা, সামনের দিকে, পঠনের অসমস্যায়িত অবিবেচনা, তার অন্ধতা, হয়তো গোঁ। পাঠক্রিয়ার পক্ষে বিবেচক হয়ে ওঠার অর্থ হল—অনেক ভারি অর্থে বিজ্ঞানের ইতিহাসে তুলনীয় ঘটনাটিকে বাশেলার হয়তো বলবেন জ্ঞানতাত্ত্বিক ছেদ—নিজের এই অন্ধতাকে দেখতে শেখা, পুনর্বিবেচনা সহ নিজের তত্ত্ব-কাঠামোর পুনর্নির্মাণ। এজন্য নিজের উদ্ভবের প্রাগৈতিহাসকে টেনে আনতে হয় তাত্ত্বিক মনোযোগ বা সমস্যাপটের মধ্যে; প্রায়ান্ধকারে যা অলিখিত, ঠাণ্ড করে পড়তে হয় তাকে। এটা সম্ভব হলে তাত্ত্বিক যে উৎপত্তিটি ঘটে, পাঠক্রিয়াকে তা সাবালক করে তোলে।

তবে মনুশকিল এখানেই যে এই সাবালকত্ব কোনো চিরকালীন এবং অক্ষয় তাত্ত্বিক বয়ঃপ্রাপ্তি নয়; এই ধাপ থেকে বারেকারে পিছলে নেমে আসাটাই হল পাঠক্রিয়ার ধারাবাহিক ভবিষ্যৎ। নিজের তাত্ত্বিক সংস্কারকে, তার প্রাক্-শর্ত এবং কাঠামোকে চিনে নেবার ব্যাপারটিকেই যদি তার সাবালকত্ব অর্জন করা বলা চলে, সেক্ষেত্রে এরকম একেবারেই নয় যে পাঠক্রিয়ার আত্ম-সমীক্ষণের সমস্যাটি এখানেই চিরকালের মতো চুকে গেল, এরপর সামনে তার জন্য অপেক্ষা করে রয়েছে প্রলম্বিত তাত্ত্বিক বিশ্রান্তি। প্রক্রিয়াটিতে কেন ইতি টানা যায় না, সে ব্যাপারে ছোট করে একটি ইংগিত দেওয়া যাক।

জ্ঞানতাত্ত্বিক যে উৎপত্তিকে তাত্ত্বিক বয়ঃপ্রাপ্তি বলে উল্লেখ করা হল, তার নিজের মধ্যে সক্রিয় তাত্ত্বিক সংস্কারটি এখনো পর্যন্ত পড়ে রয়েছে তার অবচেতন্যে। যেহেতু মতাদর্শগত তিৰ্গতা সহ নয়া কিসিমের একটি তাত্ত্বিক গোঁ তাকে ঠেলে তুলছে পুরাতন সংস্কার থেকে উপরের থাকে, উৎপত্তি পাঠক্রিয়াটি, পুনর্মর্শ্বিক-বৎ, দেখা যাবে ধরা দিয়েছে নবজর্জিত সংস্কারের দৃষ্টিভঙ্গির আলিঙ্গনে; তাই পুনর্বীর সে চ্যুত হতে বাধ্য তার অধীত আত্মোপলব্ধি, তাই তার বিজ্ঞাপিত বয়ঃপ্রাপ্তি থেকে। একটি জৈব উপমানের সাহায্য নিয়ে এভাবে হয়তো বলা চলে: নির্মৌকি উন্মোচনের এই কাজটি বারেকারে ঘটছে কি না, একটি সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য কতটা কী সজীব তা নির্ভর করছে নিজের তাত্ত্বিক অন্ধতাকে এইভাবে বারেকারে ডিঙিয়ে দেখবার সাহস, ইচ্ছা ও ক্ষমতার ওপর।

নিজ নিজ উদ্ভবের তিৰ্গতা এইভাবে ভিন্ন ভিন্ন পাঠক্রিয়াকে আপেক্ষিক করে তুলছে; কিন্তু এই আপেক্ষিকতা সংঘত, তৎ-নিষ্ঠ; তাই সে কোনো লাগাম-ছুট বেপরোয়া পরম বা কোনো ধ্রুবকত্ব নয়; সে নিজেই আপেক্ষিক। পাঠ্য যখন সাংস্কৃতিক মনোযোগ পাচ্ছে, তাই অর্জন করছে কেন্দ্রীয় উপস্থিতি, আপেক্ষিকতার এই বিনয়ী আত্মোপলব্ধির সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ অবদান সেক্ষেত্রে হল তার, অর্থাৎ পাঠ্যের, সাংস্কৃতিক স্ফীতি ও উপচয়—পাঠক্রিয়াসমূহের নানামাত্রিক ঐতিহাসিকতা, তাদের আপেক্ষিকতাই তাকে তা দিচ্ছে। দেখা যাক কিভাবে তা ঘটছে।

ভিন্ন ভিন্ন মেধাবী পাঠক্রিয়া ব্যাপ্ত হচ্ছে কোনো একটি পাঠ্যের সঙ্গে। তা হবার

সময়ে, ঐ পাঠ্যে ব্যাপ্ত অন্যন্য পাঠ্যক্রিয়া এবং পঠনের অন্তর্গত সংস্কারকে ভিন্ন ভিন্ন প্রেক্ষিত থেকে পড়তে ও বুঝতে বাধ্য হচ্ছে তারা। গ্রহণ ও বর্জনের এই মতাদর্শগত ব্যাপ্তির ফলে তাৎপর্য-ক্ষেত্রটিতে এসে জমা পড়ছে নব নব আবিষ্কৃত্য ও উপলব্ধির উপলেক্ষ ; এই সমুদয় থেকে কালে গড়ে উঠছে যাকে তাৎপর্যের উদ্ভূত বলে অভিহিত করা হয়েছে আগে। ভিন্ন ভিন্ন পঠনের দ্বারা উক্ত হবার ফলে পাঠ্য অর্জন করছে সাংস্কৃতিক ব্যাপ্তি ; এইভাবে, নিজের বাইরে নিজের উপস্থিতির দ্বারা যা ছিল এক, তা হয়ে উঠছে বহু। শৃঙ্খল ব্যাপ্তি নয়, নানা স্তরে পরিস্রুত তাৎপর্য পাঠ্যকে দিচ্ছে তার জমাট সাংস্কৃতিক ঘনত্ব।

প্রক্রিয়াটি এখানেই থামছে না। মূল্যবান পাঠ্য তো একটি নয়, অনেক। ঐতিহ্যের বিরুদ্ধ-প্রত্যয় বা গাফিলতিতে যদি তাদের কয়েকটি উপেক্ষিত থেকেও যায়, অনেক-গুণিই কিন্তু প্রবেশ করছে সাংস্কৃতিক মনোযোগের মধ্যে ; ফলে, কমবোশ, তারা অর্জন করছে কেন্দ্রীয় সাংস্কৃতিক উপস্থিতি। ভিন্ন ভিন্ন পাঠ্যক্রিয়া ব্যাপ্ত হছে এদের প্রতিটির সঙ্গে ; প্রতিটি একক পাঠ্যই আলাদা করে হয়ে উঠছে বহু। উপস্থিতির ব্যাপ্তি ও পরিস্রুতিবশত তাৎপর্যের যে ঘনত্বের কথা বলা হয়েছে, কোনো একটির তাৎপর্য-ক্ষেত্রে তা সীমাবদ্ধ থাকছে না, পাঠ্যসমূহে তার জের এসে পড়ছে ; ফলে পারিপার্শ্বিকে তাদের এই স্ফীতি পরস্পরকে যুক্ত করে একটি জমাট অখণ্ড-প্রায় সামগ্রিক চরিত্র দিচ্ছে পাঠ্যসমূহকে। অন্তর্লীন এবং বাহিরঙ্গ পঠন-পরস্পরার দ্বারা এক পাঠ্য যুক্ত হচ্ছে অন্য পাঠ্যের সঙ্গে ; প্রতিটি পাঠ্যের আগদুপিছদ ও পাশাপাশি, অনুক্রম এবং সমক্রমের অক্ষ বরাবর, ভেদরেখাগুণি প্রায় লুপ্ত করে গড়ে উঠছে পাঠ্যসত্ত্বিত, অর্থাৎ অন্তঃপাঠ্য। সামগ্রিকভাবে বাচনক্ষেত্রটি পাচ্ছে নিরবকাশ, গাঢ়তা ও সংহতি ; আপাত দৃষ্টিতে ভরাট হয়ে উঠছে তার জমি।

মতাদর্শগত আধিপত্যের সমস্যার সঙ্গে যুক্ত করেই অবশ্য সাংস্কৃতিক বাচনক্ষেত্রটির চরিত্রকে নিরূপিত করে নিতে হবে। সেক্ষেত্রে, শেষ বিচারে, তার এই আত্ম-সংহতি বড় জোর একটি আদর্শায়িত প্রবণতা মাত্র। অনুক্রমের অক্ষ বরাবর, আগদুপিছদ, এবং সমক্রমের অক্ষ বরাবর, চারপাশে, যে ক্ষেত্রটি নিরেট ও নিরবকাশ, তাই নিজের সঙ্গে ছেদহীনভাবে আশ্বিত, এরকম একটি দাবিকে চূড়ান্ত অর্থে তাত্ত্বিক স্বীকৃতি দেওয়া চলে না। কেননা এটা নিশ্চিত যে আভ্যন্তরীণ তাগিদ যদি প্রায়-বাস্তবায়িত করেও তোলে তার আত্ম-সংহতিক, সবার ও নির্বাক, দৃশ্যমান ও অদৃশ্য, প্রতিরোধ আছেই, তারা নানা চরিত্রের এবং নানা লয়ের ; এবং অতীতে যেমন বারেকারে ছেদ ও উৎগতি ঘটেছে, ভবিষ্যতেও তা ঘটবে। কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত না ছেদটি খুব গুরুত্বপূর্ণ অর্থে সামগ্রিক চরিত্র অর্জন করছে, বাচনক্ষেত্রটি নিজেকে মোটের ওপর সংহতি দিতে পারছে ; এবং প্রতিরোধকে অনেকাংশে বশীভূত, এমনকি আত্মীকৃত, করে ভরাট করে তুলছে নিজের বদনের ফাঁকফোকর, নিজের গঠনের খাঁজভাঁজকে।

পাঠক্রিয়ার সামগ্রিক ব্যাপৃতিকে কি সাংস্কৃতিক আত্ম-বীক্ষণ বা আত্ম-সমীক্ষণ বলে ধরে নেওয়া যায়? সেক্ষেত্রে, বাচনক্ষেত্রে তার নিজের প্রয়োগের এলাকাটিতে তার ভূমিকা কী, আমাদের উদ্দেশ্য ছিল একটি সীমাবদ্ধ প্রেক্ষিত থেকে সেদিকে মনোযোগ রাখা ॥ □

(১) পৃষ্ঠা—৬ (...টেনে আনা হয়েছে ঘটনা ক্রমের) :

ঘটনা ক্রম হল পাঠ্যে ঢেলে সাজাবার আগে পরপর যেমন যা যা ঘটছে ঘটনার সেই ক্রমিক পরস্পরা : ক খ গ ঘ ঙ । পাঠ্যে ঢেলে সাজাবার সময়ে, একটি অন্তর্বর্তী ঘটনা বিন্দুতে, হয়তো গ বা ঘ-তে, তাহলে শূন্য হচ্ছে কাহিনী। এই সূচনা-মুহূর্তের পিছনে যা পড়ে রইল, নির্বাচিত চরিত্র বা কথকের স্মৃতি-বাহিত হয়ে, একযোগে বা ভেঙে ভেঙে, তা এসে যুক্ত হচ্ছে কাহিনীতে। নির্মাণ ক্রম বলে যাকে অভিহিত করা হল, এভাবেই তা গড়ে উঠছে।

(২) পৃষ্ঠা—৬ (...পাঠ্য মাত্রই লেখকজন্ত) :

ওয়াক, বা সৃষ্টিকর্ম, এবং টেক্সট, বা পাঠ্য, এই দুটি সংজ্ঞায় বিভাজিত করে রলাঁ বার্ত' নিরূপিত করতে চেয়েছেন আমরা যাকে পাঠ্য-ব্যাপৃতি বলাছি তার চরিত্রকে। স্বভাবতই সৃষ্টিকর্ম যে লেখক-জন্য তা স্বীকার করে নিচ্ছেন তিনি। তবে পাঠ্য বিষয়ে তাঁর বস্তু্য হল, যেহেতু তা পাঠক্রিয়াসাপেক্ষ, কিছুটা যেন পিচ্ছিলতা অর্জন করে লেখক-কর্তৃত্বের রাশ থেকে বেরিয়ে তা সরে আসছে পাঠকের দিকে। তাকে পাঠ করবার আগে, নিজের অবরোধের মধ্যে বন্দী নিঃসঙ্গ সৃষ্টিকর্মের বিশুদ্ধ স্বরূপ কী ছিল, যাকে পাঠ্য-তন্মাত্র বলা চলতে পারে, যেমন আমরা পরে দেখব, তা বড় জোর নিষ্ফল কৌতূহলের বিষয় হতে পারে। কারণ যে মুহূর্তে পাঠক তার সঙ্গে ব্যাপৃত হচ্ছেন, অর্থাৎ তাকে পড়ছেন, ঐ পাঠক্রিয়াই লেখকের সৃষ্ট তন্মাত্রকে পরিণত করেছে পাঠ্যে; ন্যূনোন্নত অবরোধকে ডিঙিয়ে সে অন্তঃপাতী হচ্ছে অন্তঃপাঠের নানারোখ বুননের মধ্যে।

তবে বার্ত' প্রয়োবাদী। ব্যাপৃতি তাঁর কাছে তাই হয়ে উঠছে যেন এক পাঠ্যলীলা বা পাঠ্যরতি। এর ফলে কি তার নৈতিক ভারবত্তা কিছুটা ক্ষুণ্ণ হচ্ছে না? পাঠক্রিয়ায় কেবল বৌদ্ধিক তপস্চর্যা হিসেবে দেখেন তাঁরা ভুরু কঁচকাবেন জেনেও বলাছি :

বিশুদ্ধ শ্রেয়োবোধ থেকে যে পাঠ্যভ্যাস করা যায় না তা একেবারেই না, কিন্তু তার পিছনে হ্লাদিনী শক্তির সমর্থন থাকলে ক্ষতি কী ?

কর্তব্য করবার সময়ে ঔচিত্য বোধের মধ্যে ভাবাবেগের মিশেল দেওয়া চলবে না, এটাই ছিল দার্শনিক কান্টের প্রতিপাদ্য। তাঁর একটি কবিতায় এই নৈতিক কাঠিন্যবাদ বিষয়ে শিলার সুক্ষ্ম একটি ঠাট্টা করেছেন। কান্টের ভক্ত তবে উদ্ভিন্ন একজন গৃহস্থামী বন্ধুদের বলছেন, তাঁদের অভ্যর্থনা করতে পেরে আজ তিনি আহ্লাদিত। তবে আহ্লাদিত বলেই তিনি আবার যারপরনাই উদ্ভিন্ন। বিশুদ্ধ কর্তব্যবোধ থেকে, যথোচিত মানসিক স্থৈর্য সহকারে যা তাঁর করা উচিত ছিল, তার মধ্যে ভাবাবেগের এই মিশ্রণ ঘটটা উচিত ছিল না নিশ্চয়। কারণ করতে ভাল লাগলে, করাটা তো নিষ্পৃহ কর্তব্য মাত্র থাকে না। এতে করে তাঁর কর্তব্য সম্পাদনে কোনো ঘ্রুটি ঘটল না তো ? পাঠ্যভ্যাসী রামগরুড়ের ছানারা সমস্যাটিকে আশা করি একটু বিবেচনা করে দেখবেন।

(৩) পৃষ্ঠা—৭ (...হয় তাঁর উদ্যোগ) :

কাজটুকুর গুরুত্ব তা বলে কম কিছূ নয়, কেননা বারেবারে দেখাও গিয়েছে যে সার-ভাগ নয়, পাঠ্যের সং-টুকু বেছে নিয়েই সহৃদয় সামাজিক মাতোয়ারা হয়ে ওঠেন।

(৪) পৃষ্ঠা—১০ (...অতীত থেকে প্রবহমান অভ্যপ্রায়সমূহ) :

গ্রীক ধাতু নিষ্পন্ন ‘পোয়েম’ ও ‘পোয়েট্রি’ শব্দদুটির মধ্যে গড়ে তোলা বা তৈরি করার অভিধাটি কার্যকর ; কাব্য বা সাহিত্য এই বিচারে লেখক-জন্য। লাতিন ধাতু নিষ্পন্ন টেক্সট আবার তন্তুবিস্তার বা বুননের তাৎপর্যটি বহন করে। তন্তু-সন্ততির নানারোখ ঝোঁকগুলির কথা মাথায় রেখে, আমরা দেখেছি, সৃষ্টিকর্ম থেকে পাঠ্যকে আলাদা করে বার্তা তাকে টেনে আনলেন পাঠকের কাছে। তা বলে এরকম আদৌ নয় যে সৃষ্টিকর্ম যেমন যেমন পাঠ্য হয়ে উঠছে তার মধ্যে ধৃত লেখকের অভিপ্রায়সমূহ ধুয়ে মূছে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছে। শুদ্ধ লেখকই নয়, তার সচেতন ব্যাপ্তির তল দিয়ে, গোল্ডমান যাকে বলছেন ব্যক্তি-অতিক্রমী বিষয়ী, অর্থাৎ গোষ্ঠী চৈতন্য, সে-ও তো প্রবিষ্ট হয়েছিল সৃষ্টিকর্মে ; সুতরাং পাঠ্য তার জের এসে পড়তে এবং থেকে যেতে বাধ্য।

যা পড়ছি তা পড়া সম্ভব এই কারণে যে তা লেখা হয়েছে, ব্যক্তি-পরিচয়ে লেখক কে বা কী এটা এক্ষেত্রে বড় কথা নয়। যারা লিপিকার, লেখক কে, কী তাঁর অভিপ্রায়, না জেনেও এটা মেনে নেন যে লেখার মধ্যে ধৃত হয়ে রয়েছে একটি আদিম অভিপ্রায়-জানিত সত্য ; তার ওপর স্থূলহস্তাবলেপের অধিকার তাঁদের নেই। এই বিশ্বাস থেকেই তাঁরা লেখেন, যদৃষ্টং তল্লিখিতম্। তা যদি না হত, নৈরায়িকরা যে আকস্মিকতাকে বলেন ঘৃণাক্ষরন্যায়, ঘৃণ পোকা কেটেছে বলে মানবিক অভিপ্রায়-বর্জিত কিন্তু অক্ষর-সদৃশ চিহ্নাবলী, তাকেও তো পড়ে নেওয়া যেত। তা কিন্তু সম্ভব নয়।

একথা ঠিক যে আকস্মিকতা থেকেও পাঠ্য জন্ম নিতে পারে। এ প্রসঙ্গে পাঠকের

হয়তো ফরাসি জাতীয় সংগীতের কথা মনে পড়তে পারে। কিন্তু সেই আকস্মিকতা মানবিক তাৎপর্যের দ্বারা বিদ্ধ, তাই অভিপ্রায়-জন্য।

(৫) পৃষ্ঠা—১১ (...অবস্থানকে যে তাত্ত্বিক স্বেচ্ছাচারিতার দায়ে) :

তাত্ত্বিক স্বেচ্ছাচারিতার যুক্তিটিকে যৌদিক দিয়ে উপস্থাপিত করা হল, তাতে করে পাঠক এই আপত্তিটি তুলতেই পারেন যে আন্তর্জাতিক সংস্কৃতির বড়বাজারে সাম্প্রতিক কালে নব নব পঠনের এই ক্রমবর্ধমান জোগানটা কেন ঘটছে, উপরের ব্যাখ্যানে তার সদৃশতার কিন্তু পাওয়া গেল না। সরবরাহের এই স্ফীতি তাত্ত্বিক স্বেচ্ছাচারিতা থেকে তার বৈধতা জোগাড় করে নিচ্ছে, সেটা না হয় বোঝা গেল। কিন্তু এই স্ফীতি কেন? একে চাণিয়ে তুলছে চাহিদার যে তিমিগল-সদৃশ মধুব্যাধান, এটা নিশ্চিত যে সাংস্কৃতিক পণ্যায়ন, ফলত পণ্যায়িত, ফলত লাগাম-হীন উপভোগবাদ, ব্যতীত এটা কিছুতেই সম্ভব ছিল না। সাংস্কৃতিক বস্তুবাদকে এই সমস্যাটি নিয়ে বিশেষ করে ভাবিত হতে হবে।

(৬) পৃষ্ঠা—১২ (...তাৎপর্যের শব্দ সারাংশ) :

মাক্সবাদের একমাত্র বৈধ প্রতিনিধিত্বের দাবি নিয়ে স্ট্যালিনবাদ ঠিক এইভাবেই মাথা চাড়া দিয়েছিল। যে সোভিয়েট মাক্সবাদের তা চূড়ান্ত পরিণতি-বিশ্বদুঃখ তা যে ধ্রুববাদের দ্বারা অভিভূত হয়ে পড়েছিল, গ্রামশির তা নজর এড়ায়নি। অন্য যে কোনো পঠনই ছিল স্ট্যালিনবাদের চোখে অবৈধ এবং তাকে নির্মমভাবে উচ্ছেদ করাই ছিল, মধ্যযুগের খ্রীষ্টীয় ধর্মমতের মতো, তার বৈধতার একটি প্রাথমিক শর্ত। যেসব কারণ একে আপোসহীনভাবে নৃশংস করে তুলেছিল তাদের প্রধানটি নিঃসন্দেহে মতাদর্শগত আধিপত্য অর্থাৎ হেগিমোনির অভাব থেকে জাত তাত্ত্বিক উদ্বেগ।

(৭) পৃষ্ঠা—১৪ (...একমাত্র তার : সোহং) :

লক্ষ করুন, স্ট্যালিনবাদের দাবি ছিল এটাই যে মাক্সবাদের তাৎপর্য নির্যাস সমীকৃত হয়েছে তাঁর চিন্তায়। স্ট্যালিনবাদকে নাকচ করা যেহেতু মাওবাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না, নিজের সার্বভৌমত্বের সমর্থনে যুক্তিটাও তাকে পাল্টাতে হল : কালোচিত্রের দোহাই দিয়ে বলতে হল, এ যুগের মাক্সবাদ হল মাওবাদ। যুগটা অতিক্রান্ত হয়েছে কি না, ফলে সমীকরণটি এখনো চালু কি না, সে খবর অবশ্য মাওবাদীরাই ভাল রাখেন।

(৮) পৃষ্ঠা—১৪ (...পাঠক্রমের ভিন্ন ভিন্ন ধ্যান) :

‘তাকে দেখাছি’ এই বাক্যটিতে কর্তা উহ্য। বলা হয়েছে, বাক্যের স্তরে শব্দবোধকে সম্পূর্ণতা দেয় আকাঙ্ক্ষা, নৈশশব্দের আড়াল ভেঙে আমাদের অধ্যাহার করে নিতে সাহায্য করে কোন পদটি উহ্য, কী হবে তার রূপ। আমরা বুঝি, এক্ষেত্রে যা উহ্য বা উহ্য তা হল ‘আমি’ বা ‘আমরা’। বাক্যটি যদি সংস্কৃত হত, ধরা যাক ক্রিয়াপদটি ‘পশ্যামি’, তার মধ্যে যেহেতু কর্তার বচনটি নির্দেশ করা আছে, তা ‘অহম্’ বা ‘বয়ম্’ তা নিয়ে বিধার কোনো অবকাশ থাকত না, বাঙলায় যা থাকছে।

পাঠ্যের শুরুতে আকাঙ্ক্ষার সূত্রটিকে উন্নীত করার অর্থ এটা হতে পারে না যে সামগ্রিকভাবে পাঠ্যের অন্য কোনো ব্যাকরণ তৈরি করা সম্ভব। তা কোনো মতেই নয়। প্রাথমিক উৎসাহ সত্ত্বেও তাদোরভ যে পাঠ্য সম্পর্কে এ জাতের সংগঠনবাদী তত্ত্বপ্রকল্পের দিকে পিছন ফিরেছিলেন, তা এই উপলব্ধি থেকে। বৈয়াকরণ অন্যতর দাবি ছেড়ে দিতে রাজি থাকলে, একটি তাত্ত্বিক আদর্শ হিসেবে আকাঙ্ক্ষার সূত্রটি যে অন্তত কিছুদূর পর্যন্ত মূল্যবান তা হয়তো মেনে নেওয়া যায়। ভেবে দেখা যাক কেন।

পঠনের মধ্যে অনেক সময়েই নিজেকে উজার করে ঢেলে দেয় না পাঠ্য; সে সংকোচ, পুরোপুরি নিজের উদ্ঘাটক নয়। তার নৈশ্বেদ্যের মধ্যে, হয়তো তার নিশ্চেতনে, সেক্ষেত্রে যা আবৃত থেকে গেল, তাকে পড়ে নেব কিভাবে? নিদানতত্ত্ব জানা থাকলে লক্ষণ মিলিয়ে রোগ নির্ণয় সম্ভব। কিন্তু এর জন্য প্রয়োজন শারীরবৃত্তের জ্ঞান। এই লাক্ষণিক পাঠ্যক্রিয়ায় সম্ভাবনাকে জোরালো করে তুলছে আকাঙ্ক্ষার ধারণাটি, যা ভিতর থেকেই ধরে রেখেছে পাঠ্যশরীরকে।

এই অর্থে, আকাঙ্ক্ষা পাঠ্যের ধারণা-শক্তি; অনাবৃতকে সে ধরে রেখেছে যা আবৃত, পাঠ্যের প্রায়স্খকারে যা উহ্য, তার সঙ্গে। তন্তুসম্পত্তির নানামুখ বিস্তারের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে পাঠ্যকে। সে বন্ধ নয়, বলি-চিহ্নিত, আত্ম-বিভাজিত। তা বলে সে তো খানখান হয়ে ভেঙে পড়ছে না। অন্তর্নিহিত বহু-রোখ ঝোঁক সত্ত্বেও এই বিচারে পাঠ্য একটি স্বাবলম্বী তাৎপর্য-স্কন্ধ। সেক্ষেত্রে আকাঙ্ক্ষা হল সেই অবলম্বন-সূত্র, সেই আভ্যন্তরীণ ন্যায়, যা সকল ভঙ্গ-প্রবণতা, সকল অনির্দিষ্টতা সত্ত্বেও ভিতর থেকেই পাঠ্যকে ধরে ও বেঁধে রেখেছে; সে যে দুটি বা তিনটি নয়, একটি পাঠ্য-ব্যক্তি, সম্ভব করে তুলছে তার এই সাংস্কৃতিক পরিচিতি।

(৯) পৃষ্ঠা—১৭ (...বর্গে সাজিয়ে নেওয়া যায়) :

পাঠ্য-পরম্পরা, আমরা যেমন পরে দেখব, গড়ে তুলছে অন্তঃপাঠ্য। অনুলোম এবং প্রতিলোম ভেদে যে দুটি— বা হয়তো তিনটি— বর্গে তাদের সাজিয়ে নেওয়া হল, তা এক অর্থে একটি আদর্শায়িত উপস্থাপনা। ভেদরেখাগুলি স্থির বা নিশ্চিত নয়, ফলে তাদের ক্রমাগত আতিক্রম করে পরম্পরের কাছে বা পরম্পর থেকে দূরে সরে যাচ্ছে পাঠ্য। এ বিষয়ে সংক্ষেপে দু-একটি মন্তব্য করা যাক।

প্যাপিয়সী নারী, বিশেষত কুলটাদের নিয়ে সাহিত্যিক কুলপতিদের উদ্বেগের অন্ত নেই। মডেল ভগিনী-তে এই উদ্বেগ রূপ নিয়েছে জুগুপ্সিত ক্রোধে, মল ফ্রান্ডাস-এ তার পরিবর্তে দেখা দিচ্ছে প্রতিবেদকের কৌতূহল; তেমনি আনাতোল ফ্রাঁসের তাই-তে যদি মৃদু হয়ে ওঠে ভূয়োদর্শী লেখকের নির্লিপ্ত কৌতুক, মরিয়াকের তেরেস-এ বড় হয়ে ওঠে সুগভীর অনুকম্পা। খলনায়ক বা নায়িকা যার প্রেক্ষিত থেকেই দেখি, রেস্টোরেশন নাটক থেকে বিদ্যাসুন্দরের কাহিনীতে ব্যাভিচারকে যন্ত্রণা করা হচ্ছে ভিন্ন ভিন্ন সামাজিক রুঁচির সঙ্গে, অবদমিত হচ্ছে নৈতিকতার প্রশ্নটি।

কিন্তু ব্যাপারটি এখানেই শেষ হয়ে যাচ্ছে না। বহু দশক আগে একজন ফরাসি পণ্ডিত এরকম একটি বক্তব্য রেখেছিলেন যে সাহিত্যে রূপায়িত প্রেম যখন অসামাজিক অথচ নিখাদ ও সাঁচ্চা অথবা, যেমন মানোঁ লেস্কেতে, অনিরূপিত, তাই রহস্যময়, তার বিবিস্তি তাকে ঘন এবং আর্দ্র করে তোলে। উদাহরণ : কৃষ্ণ ও রাধা, অথবা ট্রিস্ট্রাম ও ইজ্জুট। অবশ্যই এগুলি কোনো পাঠ্য নয়, কিন্তু নানা পাঠ্যে এসব প্রেম কাহিনী যখন রূপায়িত হয়েছে, অনেক সময়েই বিষয় তীরতা তার একটি প্রধান উপাদান থেকে গিয়েছে। এ প্রসঙ্গে দাস্তুর মহাকাব্যের নরক বিভাগের পঞ্চম সর্গে বর্ণিত পাওলো ও ফ্রাঙ্কেস্কার কথা পাঠকের হয়তো মনে পড়বে।

কিন্তু আধুনিক উপন্যাসে যখন সমস্যাটি নিয়ে ভাবিত হচ্ছেন লেখক—যে উপন্যাস এখন হয়তো ততটা আর আধুনিক নয়—তার চরিত্র ফ্লবেরার, শ্তাঁদাল বা বালজাকে যা, টেলস্টয়ে আদৌ তা নয়; ঘরের কাছে, বস্কিমচন্দ্রে যে রূপ তা পাচ্ছে, ভিন্নতা সহ রবীন্দ্রনাথ বা শরৎচন্দ্রে তা নয়। অনুলোম বা প্রতিলোম যে বর্ণ দিয়েই এদের ভাবি না কেন, পাঠ্য-সংসারের দুটি প্রান্তে শক্ত, নিরেট জমিতে অনড়ভাবে দাঁড় করিয়ে তাদের নিরূপিত করা চলবে না।

তাহলেও বর্ণভেদটির পিছনে যুক্তি একটি আছেই। স্মরণ করুন ইংরেজি এবং বাংলায় লিখিত দুটি উপন্যাস : কিম ও গোরা। প্রয়াত সুবীর রায়চৌধুরী লক্ষ্য করেছিলেন, কিমের বিরুদ্ধে একটি প্রতিবাদী অন্তঃপঠন ব্যতীত গোরা-র যুক্তি অসংগঠিত থেকে যেত। অনুলোমের অক্ষ বরাবর উপন্যাসটিকে যদি আমরা ফেলিক্স হোল্ট-এর সঙ্গে যুক্ত করি—অবশ্য তহবিল তছরূপের দায়ে রবীন্দ্রনাথকে দায়রায় সোপর্দ না করে—প্রতিলোম অক্ষটি বরাবর এতে এমন একটি মেধাবী প্রতিবাদী যুক্তি প্রবেশ করছে, যাকে উপেক্ষা করা হবে কফিহাউস-শোভন বামপন্থী বালখিল্যতার একটি সর্বোত্তম উদাহরণ। ভারতে লালিত দুটি আইরিশ যুবকই ভারতবর্ষকে খুঁজছে, কিন্তু এই অন্বেষণ কোথায় তাদের পেঁাছে দিচ্ছে? সাম্প্রদায়িকতার উদ্বেগ যে ভারতবর্ষের ঠিকানা, গোরা-র বিশ্বাস, পরেশবাবু রাখেন, তার জাতীয়তাবাদী এবং ভাববাদী সীমাবদ্ধতা কোথায় তা আমরা হয়তো জানি। কিন্তু শতাব্দীর এই কদর্য শেষ দশকে তাকে উপেক্ষা করার অধিকার কি আমাদের আছে?

অনুপাঠ্য এবং প্রতিপাঠ্য—অর্থাৎ অনুলোম পাঠ্য এবং প্রতিলোম পাঠ্য—হিসেবে অন্তঃপাঠ্যের টানাপোড়েন বা বদননের মধ্যে স্থাপিত করে গোরা-কে দেখলে, স্মৃতরাং, বিবেচনার একটি সামগ্রিক কাঠামো তৈরি হয়; অন্তঃপাঠ্যের যে দো-মোহনায় উপন্যাসটির অবস্থান, সহজ হয় তার স্থানাঙ্ক নির্ণয়।

ঐ একই কারণে আবার মনোযোগের অসংহতিবশত বদননের একটি অক্ষ যদি আমাদের বিবেচনার বাইরে সরে যায়, ফলে উপন্যাসটিকে যদি কেবল একটি অনুপাঠ্য বা শুধু একটি প্রতিপাঠ্য হিসেবে দেখতে বাধ্য হই আমরা, আমাদের পঠনের মধ্যে এসে পড়ে

তাত্ত্বিক একপেশেমি, হয়তো অসহিষ্ণু অবস্থাপনা। এক্ষেত্রে আরো যা বড় কথা, নিছক অনুপাঠ্য হিসেবে গোরা কী, তাকে ছাপিয়ে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে প্রতিপাঠ্য হিসেবে তার পরিচয়। ইংল্যান্ডে দ্বিতীয় রিফর্ম বিলের সাংস্কৃতিক পটভূমিকায় লেখা একটি উপন্যাসের নিছক একটি অনুপাঠ্য অথবা, সরাসরি, কুস্তীলক-বৃত্তির উদাহরণ হিসেবে দেখলে, অভিযোগের ভুল-ঠিকের প্রশ্নটি ছাড়াও, আমাদের মনোযোগের বাইরে চলে যায় প্রতিবাদী অন্তঃপাঠনের সেই অবলম্বন-সূত্রটি যা বেয়ে গড়ে উঠেছে উপন্যাসটি।

এতে অবশ্য সমালোচকের আশ্ব-প্রসাদের কোনো হেরফের ঘটে না। নির্বোধ বিগ্রহ-পূজার বিরুদ্ধে সাড়া-জাগানো এবং, তাঁর বিচারে, প্রয়োজনীয় সাংস্কৃতিক প্রতিবাদ তো একটি করা হল!

(১০) পৃষ্ঠা—২৫ (...নব নব আদল দেয়, অতীতকে) :

ব্যাসকূটটি নিয়ে একটু ভেবে দেখা যাক।

কোনো সমাজ বা যুগ বিবরণে তন্ন তন্ন করে অনুসন্ধান করে যখন কোনো ইতিহাস রচনা করা হয়, সকল খুঁটিনাটি সহ, অবিকল, তার নিখাদ সামগ্রিক রূপটি যে গবেষণা কর্মে তুলে নেওয়া সম্ভব, ইতিহাস রচনার চূড়ান্ত আদর্শ বিষয়ে এটাই ছিল রাস্কের নিশ্চিত দৃষ্টবাদী দাবি। রদেল-এর হাতে পুঙ্খ সাবিক ইতিহাসের প্রবল উপস্থিতি সত্ত্বেও দৃষ্টবাদী ঐতিহাসিক দাবিটি নিঃসন্দেহে পরিত্যক্ত হয়েছে। সংখ্যাগত তথ্যের মধ্যে কোন-গুলিকে বেছে নেওয়া হবে সে প্রশ্নটি ছাড়াও, এটা নিশ্চিত যে কোনো ইতিহাসই, অথাৎ কোনো ঐতিহাসিক পঠনই, তার উদ্ভবের ঐতিহাসিকতা, ফলত মতাদর্শগত তির্যগতা, থেকে মুক্ত নয়। সামনে, ইতিহাসের দিকে সে যেমন যেমন মনোযোগ দিচ্ছে, পিছন থেকে উদ্ভবের যুক্তি মেনে তার ভিতরে গড়ে উঠেছে তার তত্ত্বাদর্শ। ফলে আপ্রাণ তন্মিষ্টা সত্ত্বেও তাত্ত্বিক আপেক্ষিকতা থেকে সর্বাংশে সে মুক্ত নয়।

এ তো গেল সমস্যার একটি দিক। সাংস্কৃতিক গবেষণাকর্মের ক্ষেত্রে এর সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে অপর একটি বৈশিষ্ট্য : একে তার চক্রগামিতা বলা যাক। সংস্কৃতি বিষয়ক যে কোনো একটি পাঠ্য লেখবার আগে সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য বা থাকে, লেখবার পরে, যতটা সামান্যই হোক, তার চরিত্র কিছুটা পাল্টায়, কেননা ঐ ঐতিহ্যটির অঙ্গীভূত হয় পাঠ্যটি নিজেই। বিষয় হিসেবে হৃদিকে মনোযোগটি নিবদ্ধ করা হয়েছিল, বিষয়ী পঠন হয়ে উঠল তার তাত্ত্বিক সম্প্রসারণ মাত্র। এই অঙ্গ্যাঙ্গিভাবে ফলে পাঠ্যটি হয়ে উঠেছে অঙ্গী সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ, উদাহরণ স্বরূপ, ভৌত রসায়নের কোনো পাঠ্য বা এমনকি অর্থনীতির কোনো পাঠ্যের ক্ষেত্রে কিন্তু এই অঙ্গ্যাঙ্গিভাব বা চক্রগামিতার সম্পর্কটি উপস্থিত নয়।

এটা ঘটছে এই কারণে যে অনেক দূর পর্যন্ত সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য নিজেই একটি বাচন-ক্ষেত্র, ভৌত রসায়নের জগৎ বা অর্থনীতির জগৎ বা নয়। তাদের ক্ষেত্রেও নিজ নিজ

বাচন গড়ে উঠছে, যাদের গুরুত্ব অপরিসীম ; কিন্তু তার তার বাচনক্ষেত্রটির সঙ্গে তাকে তাকে গুলিয়ে ফেলাটা হবে তাত্ত্বিক উদ্ভ্রান্তির লক্ষণ : বর্গ ভ্রম। তাই নিজের বাচনক্ষেত্রটি যত যা গুরুত্ব অর্জন করুক না কেন, অর্থনৈতিক জগৎ পড়ে রয়েছে তার বাইরে ; প্রকৃতি বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে কথটা নিশ্চয় আরো বেশি করে সত্য। অন্য দিকে সংস্কৃতি লোকটি তার বাচন ক্ষেত্রের দ্বারা অনেক বেশি দূর পর্যন্ত অন্তঃপ্রবিষ্ট, এবং ভিন্ন ভিন্ন সাংস্কৃতিক পাঠ্য নিজেরা ঐ বাচনক্ষেত্রটির এক একটি সংগঠক উপাদান। এই কারণে একটি সাংস্কৃতিক লোক থেকে যদি সবকিছু সংস্কৃতি বিষয়ক পাঠ্য কেড়ে নেওয়া হয়, তদ-বিষয়ক বাচনক্ষেত্রটির সঙ্গে সাংস্কৃতিক লোকটির তদাত্ম্য এত গভীর, এত আবিচ্ছেদ্য, যে শুধু বাচনক্ষেত্রটি নয়, সেক্ষেত্রে সংকুচিত হয়ে পড়বে সামগ্রিকভাবে সাংস্কৃতিক জগৎটি।

আরো বড় কথা হল, এই অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়বৎ বা নিশ্চেষ্ট নয়। এর মধ্যে যে চলিষ্ণু সচেতনতার চরিত্র এসে পড়ে তা-ই হল তার চক্রগামিতা। সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য থেকে পুঁটি সংগ্রহ করে ভিন্ন ভিন্ন পোষ্য পঠন ; যেমন, চক্রবৎ, তারাই আবার পোষক সংস্কৃতিকে নব নব সংজ্ঞা ও মাত্রা, নব নব তাত্ত্বিক নির্দিষ্টতা দেয় ; ফলে পুঁটি পায় পোষক ঐতিহ্যটি নিজেও। ইংরেজি সমাজ, ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিষয়ে গত পঞ্চাশ বছরে গড়ে ওঠা মার্ক্সবাদী পঠনের কথা স্মরণ করুন : হিল থেকে টম্পসন, উইলিয়ামস, নেয়র্ন, ইগলটন, এলেন মিল্কিন্স উডের পাঠ্যগুলি কি নিশ্চেষ্টভাবে বাচনক্ষেত্রের অঙ্গীভূত হচ্ছে? না কি তাদের সাঙ্গীকরণের ব্যাপারটি, সাংস্কৃতিক চক্রগামিতার দরুণ, বাচনক্ষেত্রটিকে নব নব আদলও দিচ্ছে? তা যখন দিচ্ছে, তখন কাসিরের-এর একটি পদবন্ধকে একটু পরিবর্তিত করে, সাংস্কৃতিক পাঠ্যক্রমের এই অবিরত আগু-পিছ গমনাগমনকে, তার চক্রগামিতাকে, পশ্চাদ-মুখী সম্মুখগামিতা বলে অভিহিত করা যাক না কেন।

(১১) পৃষ্ঠা—২৫ (... যে ভাষা কেড়ে নেওয়া হয়েছে) :

কলম্বাস আমেরিকা আবিষ্কার করেছেন আজ পাঁচশ বছর হল। উক্ত বছরেই, ১৪৯২ সালে, লিখিত হয় আধুনিক ইউরোপীয় ভাষা-সমূহের প্রথম ব্যাকরণটি : গ্রামাটিকা। লেখক আন্তোনিও দে নেরিহা রাণী ইজাবেলাকে মনে করিয়ে দেন যে ব্যাকরণ হল রাজ্য শাসনের সহকর্মী ও মিত্র। শাস্ত্রটি যে শাসনের একটি হাতিয়ার, অভিলার বিশপও রাণীকে তা বোঝান। দুই যোদ্ধাই যে একই সময়ে এই সত্যটি অনুধাবন করতে পেরেছিলেন, তার কারণ মনে হয় হিস্পানী সাম্রাজ্যের স্বরাশ্রিত ভৌগোলিক স্থিতি।

তা বলে যোগসূত্রটি যে এর আগে আবিষ্কৃত হয়নি, তা কিন্তু নয়। এর দু-হাজার বছর আগে কনফুসিয়াস এবং দেড় হাজার বছর আগে সিসেরো সত্যটি হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন : শ্বিতীয়োক্ত মণীষীর দে ওরাটোরে বা বাসিতা বিষয়ক প্রস্তাব হল অনেকাংশে

ঐ উপলব্ধির ফলশ্রুতি। আমাদের দেশের শাস্ত্রজ্ঞরাও জানতেন, শব্দ শব্দ নয়, শাসনের জন্য প্রয়োজন শাস্ত্রেরও ; এবং ভাষাজ্ঞান ব্যতীত শাস্ত্রচর্চা অসম্ভব। এজন্য এমনকি উচ্চারণকেও নিভুল করা প্রয়োজন, নতুবা 'ইন্দ্রশব্দ' পদটির ভুল উচ্চারণের জন্য বৃদ্ধের ভাগ্যে যে বিপর্যয় ঘটেছিল, তা ঘটাতো অসম্ভব নয় !

অত্যাচ-শিক্ষিতদের হিসেবের বাইরে রেখেই বলছি, এটা সৌভাগ্যের বিষয় যে ব্রাত্য বা দাসের কানে খবরটা এসে পৌঁছয়নি। তাই প্রভুর ভাষা যখন যে শেখে, ক্যালিব্যানের মতো প্রতিরোধে যদি সে বদ্ধপ্রতিজ্ঞ হয়, তা সে শেখে, না, মন্তোচ্চারণ নয়, ঘৃণা সহ প্রভুকে অভিসম্পাত দেবার জন্য। কিন্তু তা যে সে শিখতে বাধ্য হচ্ছে তা তো এই কারণেই যে তার মুখ থেকে কেড়ে নেওয়া হয়েছে তার নিজের ভাষা। ভেবে দেখা যাক কিভাবে তা ঘটছে।

রোমান শাসকরা এটা লক্ষ করেছিল যে হাতিয়ার বা যন্ত্র তিন কিসিমের : এক, যা নিঃশব্দ, যেমন কুমোরের চাক বা ছুতোরের তুরপুন ; দুই, যা শব্দ করে, যেমন গরু বা ঘোড়া ; এবং তিন, যা কথা কয়, যেমন দাস। কিন্তু আভ্যন্তরীণ আগ্রাসন নয়, বহিরাঙ্গমণ যখন মদুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেয় বিজেতা ও বিজিতকে, বিজিগীষা ও জ্ঞাতিদপের সঙ্গে বিজেতার চৈতন্য এসে যুক্ত হয় সাংস্কৃতিক অপরিচিতি থেকে জাত সন্দেহ ও তাল্চিল্যাবোধ। সাংস্কৃতিক বর্বরতা অর্জন ক'রে তার পক্ষে তখন ভেবে নেওয়া সম্ভব হয় যে বিজিত হল নির্বাক, তাই অবমানব। স্টিফেন গ্রীনব্ল্যাট দোঁখিয়েছেন যে পরাভূত এবং অধিকৃত দক্ষিণ আমেরিকাতে ঠিক এটাই ঘটেছিল, তাই ক্যালিব্যান হয়ে উঠেছিল ভাষা থেকে বঞ্চিত 'নির্বাক অবমানবদের' প্রতিনিধি— এই অবমূল্যায়নের বিরুদ্ধে ম'তেন, বিশেষ করে লাস কাসাস-এর সাহসী প্রতিবাদ সত্ত্বেও।

আমাদের শাস্ত্রকাররা বলেন, আমরা ভাষা শিখি বৃদ্ধ ব্যবহার থেকে। অভিনব কুমার শোনে 'গামানয়', দেখে গরুটিকে আনা হল। 'গাম' এবং 'আনয়' এ দুটি পদকে মনে মনে গরুটিকে আনবার ব্যাপারটির সঙ্গে সে যুক্ত করে। সম্যক না মানলেও ভাষার এই বস্তু-এবং ব্যবহার-নির্দেশের ক্ষমতাকে এদেশের ভাষাচার্যরা সংগত কারণেই মানতেন। সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের ফলে সামাজিক আদান-প্রদানের সদর থেকে তিরোহিত-প্রায় ভাষার স্মৃতিকে টিকিয়ে রাখতে বাধ্য হয় নিপীড়িত মানদুষ। তাই 'ম্যাক'সের নৈশেব্দ্যের এক শতক-এ দেখি লাতিন আমেরিকায় কিয়দংশে ঐ ক্যালিব্যানের উত্তর-পূর্বদিকে লিখে রাখতে হচ্ছে : 'ইহা হয় গরু' বা 'ইহা হয় বৃক্ষ'।

এই আগ্রাসনের বিরুদ্ধে সাংস্কৃতিক প্রতিরোধ তা বলে থেমে থাকছে না। এমে সেজারের বা আরো অনেকের উদাহরণ টেনে এডোয়ার্ড সাইড যেমন দেখাচ্ছেন, এ ব্যাপারে কেন্দ্রস্থতা অর্জন করছে শেক্সপীয়রের নাটকটি ; তাই অনেকাংশে প্রতিবাদ দানা বাঁধছে ক্যালিব্যানের প্রতীকী তাৎপর্ষ্যকে ঘিরে।

(১২) পৃষ্ঠা—২৬ (...তা চলতে থাকে) :

এই প্রসঙ্গে, হাফকা মেজাজের হলেও, প্রতিবাদী পঠনের সর্বাপেক্ষা মজার গল্পটি সম্ভবত আউট অব আফ্রিকা-তে বর্ণিত সেই ঘটনাটি। দা মার্চেন্ট অব ভেনিস-এর কাহিনীসূত্র শুনলে ফারা, ব্রাঙ্কেন-এর সোমালি ভূতটি, গল্পটিকে ভাবা শুরুর করল শাইলকের দিক থেকে, কিভাবে আইন মোতাবেক প্রতিশোধ নেওয়া সম্ভব ছিল তার পক্ষে। এই নাটকটির মণ্ডায়নই কিন্তু সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ঐতিহাসিক চরিত্র অর্জন করেছে আজকে, টেল আভিভে, যখন শতকরা একশ জন ইহুদি দর্শকের সামনে বিশেষভাবে জিঘাংসু রূপ দিয়ে হাজির করা হচ্ছে শাইলককে, তাঁদের মনে করিয়ে দিতে যে যত না অবদমিত, তার সাম্রাজ্যবাদী চরিত্রের বাবদে ইহুদি জাতিসত্তা তার চাইতে অনেক বেশি করে আগ্রাসী হয়ে উঠেছে আজ।

এরকম কোনো পঠন দিয়ে নাথান দা ওয়াইজ-কে সমসাময়িক তাৎপর্য দেওয়া যায় কি না তা নিয়ে ভেবে দেখা যেতে পারে।

(১৩) পৃষ্ঠা—২২ (...সাংস্কৃতিক বোঁগপত্তের শৃঙ্খলাটি) :

তুলনীয়ভাবে, কাফকার কথা বলা যেতে পারে; অথবা, ঘরের কাছে, জীবনানন্দের বাল্মবন্দী পাণ্ডুলিপিগদ্যলির কথা। তবে, লক্ষ করুন, এঁরা কেউই সাম্রাজ্য-মহিমার আদিপুরুষ কোনো ধর্মনিষ্ঠ আইনেন্সকে নিয়ে লিখছেন না, লিখছেন মহিমা-চ্যুত প্রান্তিক জনের কথা। পাঠ্যসংসার থেকে কাফকার পাঠ্যগদ্যলি অবলম্বিত হলে বা, জীবনানন্দের ক্ষেত্রে, তার কিনারায় তারা অপেক্ষা করে থাকলে, কতটা আমরা হারাভাম তা ভাবাও কঠিন। স্টার্নারের বক্তব্যের জের টেনে বলা যেতে পারে, ডস্টয়েভস্কি থেকে শুরুর হলেও, কাফকার সাহিত্যে পৌঁছে তবেই কেবল যে বিকেন্দ্রিত সে অর্জন করল কেন্দ্রস্থতা; ফলে, আধুনিকতার জন্মলগ্নেই, অস্ত্রবাসীকে ঘিরে গড়ে উঠল আমাদের মনোযোগ। পাঠ্যের অনুপস্থিতিতে এই ধারাবাহিকতার ন্যায়টা আমাদের মনোযোগের বাইরে থেকে যেত, তার জের এসে পড়ত জীবনানন্দেও। তা বলে রাখা যে সম্পূর্ণ উপেক্ষিত থেকে যেত তা হয়তো নয়। কেননা কুন্দেরা দেখিয়েছেন যে ঐ প্রাগ নগরেই, কাফকার একজন সমসাময়িকেরই হাতে, সৃষ্ট হচ্ছে ছোট মানুষ সোয়াইগ, যে জোসেফ কে-র হয়তো একমাত্র বিকল্প অহং। তবে সে প্রতিবাদী, জোসেফ কে, মালাবান বা বাঘারু যা নয়। তাত্ত্বিক গভীরতা দিয়ে ঐ প্রতিবাদের সূত্রেই আবার তাকে বেছে নিচ্ছেন রেশ্ট।

(১৪) পৃষ্ঠা—৩০ (...অন্তত তাকে মানায় না) :

দার্শনিক বৃদ্ধের একজন রেবাই-এর কথা লিখেছিলেন, লোকসমাজ ঈশ্বরের কথা শুনতে চায় না বলে ক্ষুদ্র হৃদয়ে যিনি চলে গিয়েছিলেন, মরুকান্তারে। ঈশ্বর কিন্তু তাঁর মুখে তাঁর ভক্তিগাথা শুনতে নারাজ; বললেন, 'না, তুমি ফিরে যাও সংসারে। শুনতে

না চাইলেও সংসারকে উদ্দেশ্য করেই উচ্চারিত হোক তোমার যাবতীয় প্রার্থনা। লোক-সমাজের বিধরতার মধ্যেই আমি পেতে রেখেছি আমার কান।' একথা ঠিক যে পাঠক যখন উৎকর্ষ, পাঠ্যের বিবক্ষা তখনই কেবল সার্থক হয়ে ওঠে। কিন্তু ততক্ষণ, বদ্বেরের ঈশ্বরের মতো, পাঠকের বিধরতার মধ্যেই সে তার সোচ্চারতা নিয়ে নিঃশব্দে অপেক্ষা করে।

(১৫) পৃষ্ঠা—৩০ (...গোচরে আনতে বাধা হয় সে) :

সাংস্কৃতিক মূল্যায়নের পালাবদল ছাড়াও, অন্য প্রেক্ষিত থেকে আগেও যেমন লক্ষ করা হয়েছে, অপর একটি কারণে তা ঘটছে এবং আরো বেশি করে তা ঘটবে : এটি হল সংস্কৃতি শিল্পায়নের অন্তর্নিহিত ক্রমবিস্তারের ঝোঁক। সম্ভব হলে মার্গ সাহিত্যের চৌহদ্দির মধ্যে, নিতান্ত না হলে তার বাইরে, নতুন নতুন পঠনের সম্ভাবনাকে উৎপাদন না করে নিলে সাংস্কৃতিক পণ্যের জোগানে যেমন ঘাটতি পড়বে, তেমনি নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখাই কঠিন হয়ে পড়বে গবেষণা কেন্দ্রগুলির পক্ষে। ফ্রাঙ্কফুর্ট স্কুলের তাত্ত্বিক অবস্থানের মধ্যে না গিয়েও তাই বলা যায় যে প্রাণধারণের তাগিদই বাধ্য করছে পঠনের— ফলত পাঠ্যেরও— ক্রমপ্রসারণ।

যে নিঃস্বার্থ বৌদ্ধিক চর্চার প্রশংসায় পণ্ডমুখ লিবারাল বিবেক, তা এতটা কামগন্ধহীন নয় তবে আর !

(১৬) পৃষ্ঠা—৩১ (...বিদায় দেবার বিধান দিয়েছেন) :

যা পড়া যায় তাই পাঠ্য। আমেরিকার সংবিধানকে যদি একটি পাঠ্য বলে মেনে নেওয়া যায়, গুরুত্ব অনেক কম হলেও বিচারকের রায়ও সে দাবি রাখতে পারে। সেক্ষেত্রে, ওকালতি পরিভাষায় যাকে অবিটার ডিক্টাম বা ডিক্টা বলা হয়ে থাকে, রায়ের মূল প্রতিপাদ্যের সঙ্গে যা নিঃস্পর্ক, টিলক তাকে অর্থবাদের সঙ্গে তুলিত করেছেন।

(১৭) পৃষ্ঠা—৩৩ (...এবং চক্রবৎ) :

তুলনীয় একটি প্রক্রিয়াকেই নির্দেশ করছে হারমেনিউটিক চক্র। তবে সেখানে জোরটা এসে পড়ছে পাঠ্যের সামগ্রিকের সঙ্গে টুকরো টুকরো করে নির্বাচিত তার ভিন্ন ভিন্ন অনুপদংশ ও উপাদানগুলির সম্পর্কের ওপর। পাঠ্য সম্পর্কে সামগ্রিক একটা প্রত্যাক্ষা নিয়ে তার সঙ্গে ব্যাপ্ত হচ্ছে পাঠক্রিয়া ; অতঃপর বেছে নেওয়া হচ্ছে মূলত সেই সব উপাদানগুলিকে যারা, চক্রবৎ, পরিপুষ্ট করছে সামগ্রিকের ঐ ধারণাটিকেই। এইভাবে হারমেনিউটিক চক্রের অনিবার্য মদতে প্রতিটি পঠন জানছে সে অভ্রান্ত। পাঠক্রিয়ার পিছন দিকে, ব্যক্তিসংস্কারে এর ফলে যে মনস্তাত্ত্বিক অন্ধতা জন্মাচ্ছে, এবং ঐ অন্ধতা-জানিত আত্মপ্রসাদ ও আত্মশ্লাঘা, এবং তাদের সমবেত বিক্রিয়ায় পুষ্ট হচ্ছে যে বিজগীষা, এখানে আমার উদ্দেশ্য হল সৌদিকে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করা।

(১৮) পৃষ্ঠা—৩৩ (... আরো দৃঢ়মূল হয়ে ওঠে) :

বয়সের সঙ্গে সঙ্গে যে সমালোচক এত বেশি করে অজিঙ্কাসদ্ এবং অসহিষ্ণু হয়ে ওঠেন, তার কারণ কি এই অসমস্যায়িত সংস্কারের মেদবৃদ্ধি? ফলে তার তাত্ত্বিক স্কেরোসিস? □